স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা
৭০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।।
২৭ নভেম্বর ২০১৭।।
১০ অগ্রাহয়ণ - ১৪২৪।।
যুগাব্দ ৫১১৯।।
website : www.eswastika.com ।।

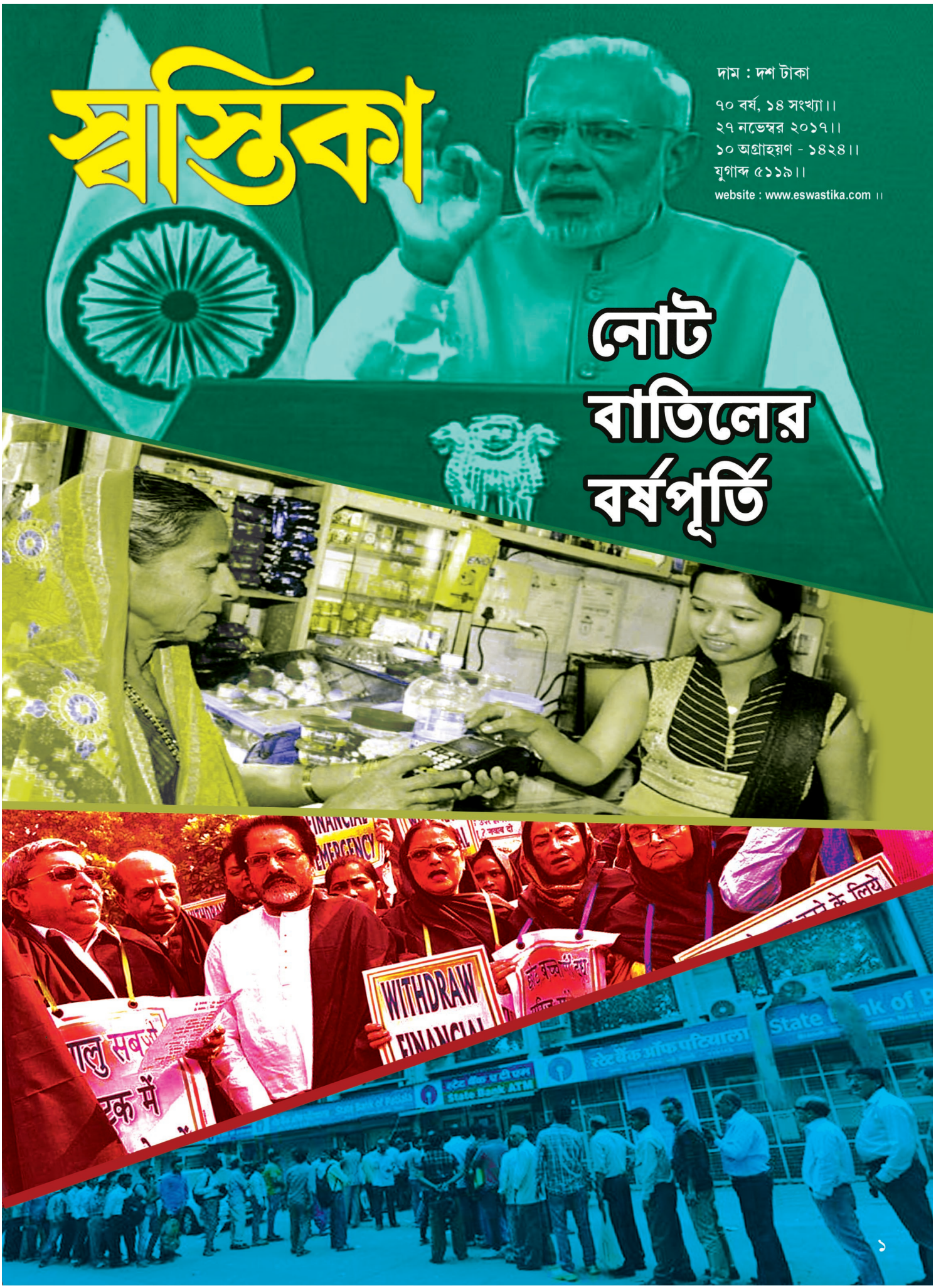

নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৭ নভেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

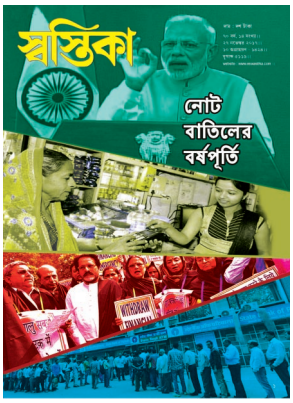

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

চটি পিসির ভাইপোদের দৌরাত্ম্যে বিপন্ন বঙ্গভূমি

▯ গূঢ়পুরুষের কলম ▯ ১০

খোলা চিঠি : জ্বরেও জল! জবাব নেই দিদির

▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

নোট বাতিলের সুফল দেশ পেতে শুরু করেছে

▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১২

নোট বাতিল আর্থিক সংস্কারে একটি সাহসী পদক্ষেপ

▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১৪

পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু মহামারী, রাজ্য সরকার নির্বিকার

▯ ডা: কিংশুক গোস্বামী ▯ ১৫

গণতন্ত্র গুঁড়িয়ে দিয়ে ও সর্বোচ্চ আদালত কব্জা করে নোবেল

চান হাসিনা ▯ ১৬

নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি ▯ ১৯

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নোটবন্দি এক

মাইলফলক ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ২০

নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি এবং অথ কালাদিবস

▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ২২

নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োচিত

▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ২৩

নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত একদিন গর্ব করবে

▯ অরুণ জেটলি ▯ ২৭

জাগ্রত জল্পেশ ▯ আশিষ ভট্টাচার্য ▯ ৩১

কড়ি গাঁথা নকশা ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩২

যমরাজের হিসাব লেখক ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩৩

আজি কমলমুকুল দল খুলিল ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০**

▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৭** ▯ **অন্যরকম : ৩৮** ▯

স্বজন বিয়োগ : ৩৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিতর্কিত বিশ্ববাংলা

সম্প্রতি মুকুল রায় অভিযোগ করেছেন, রাজ্য সরকারের হস্তশিল্প সংক্রান্ত উদ্যোগ বিশ্ববাংলার মালিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার নামেই রেজিস্টার অব কোম্পানিজে নথিভুক্ত। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোনো প্রকল্পকে সরকারি প্রকল্প বলে চালানোর মধ্যে যে চরম দুর্নীতি রয়েছে তা কারও বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভাব্য সেই দুর্নীতি নিয়ে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে তিনটি অন্তর্তদন্তমূলক রচনা। লিখবেন— ড: পঙ্কজ কুমার রায়, রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও দেবাংশু ঘোড়ই।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দ্বিচারিতা

প্রায় এক বৎসর পূর্বেই সঞ্জয় লীলা বনশালির পদ্মাবতী ছবিকে ঘিরিয়া বিক্ষোভ শুরু হইয়াছিল। রাজস্থানের জয়পুরে ছবির শ্যুটিং পর্বেই স্থানীয় মানুষ আপত্তি জানাইয়াছিল। আপত্তির বিষয় হইল আলাউদ্দিন খিলজির সঙ্গে রানি পদ্মাবতীর একটি ঘনিষ্ঠ স্বপ্নদৃশ্য। দৃশ্যে রানি পদ্মাবতীকে নর্তকী হিসাবে দেখানো হইয়াছে। ছবির পরিচালক স্থানীয় মানুষদের কথা দিয়াছিলেন ছবিতে আপত্তিকর দৃশ্য বাদ দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয় হইল সঞ্জয় লীলা বনশালি তাঁহার কথা রাখিতে পারেন নাই। ছবির পোস্টার ও ট্রেলার মুক্তি পাইয়া জনসমক্ষে আসিলে জয়পুরের সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজস্থান উত্তাল হইয়া ওঠে। এরই মধ্যে ছবিটি ১ ডিসেম্বর মুক্তি পাইবার ঘোষণায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হইয়া যায়। বিক্ষোভের কারণ শুধুমাত্র আপত্তিকর দৃশ্য বাদ দিতে হইবে। পরিচালক মহোদয় ইহাতে নারাজ। তাঁহার যুক্তি পদ্মাবতী চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। কিন্তু ছবিটিকে তিনি কাল্পনিকও ঘোষণা করিবেন না। কারণস্বরূপ বিক্ষোভ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। কলকাতাতেও তাঁহার আঁচ বাড়িতেছে।

তথাকথিত সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা বলিতেছেন ইহাতে নাকি শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। তাঁহারা এক বিশেষ ছবির প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের কথা বলিতেছেন। আরও বলিতেছেন ইহাতে নাকি দেশ পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিতেছেন না যে, এই চলচ্চিত্র দেশের মানুষের একটি বড় অংশের ভাবাবেগকে আহত করিয়াছে। দেশের ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষ পদ্মাবতীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাত্র কয়েকমাস আগে জুলফিকার ছবি লইয়া পশ্চিমবঙ্গ জুড়িয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রচণ্ড বিক্ষোভে শামিল হইয়াছিল। তাহাদেরও দাবি ছিল ইসলাম অবমাননার। তাহাদের জঙ্গি বিক্ষোভে ছবির পরিচালক ও টেকনিশিয়ানরা এডিটিংরুমে বসিয়া যে দৃশ্যগুলি তাহাদের ভাবাবেগকে আঘাত করিবার মতো সেগুলি বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেদিন তাহাদের দাবির পক্ষে রাজ্যের দুই-একজন বড় মাপের রাজনৈতিক নেতাও নাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে পরিচালকের ওপর চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেদিন কিন্তু সীতারাম ইয়েচুরি বা পশ্চিমবাংলার মুক্তমনা উদার শিল্পীরা শিল্প বা শিল্পীর স্বাধীনতা বা বাকস্বাধীনতা নষ্টের মতো কোনো কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। সেদিন তাঁহারা ছিলেন মৌন। সেই তাঁহারাই আজ একই প্রকারের যুক্তিতে মুখর হইয়াছেন। ইহা কি দ্বিচারিতা নহে?

বস্তুত ভারতের হিন্দু সমাজ চিরকালই সহিষ্ণু। সহিষ্ণুতাকে দুর্বলতা ভাবিয়া শিল্পী স্বাধীনতার নামে দেশের ইতিহাস বিকৃত করা কিংবা ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা সহিষ্ণু সমাজকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলারই শামিল। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ সত্যি কথাই বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ফিল্ম নির্মাতাদের কয়েকজন ইচ্ছা করিয়াই হিন্দুধর্মকে অবমাননার চেষ্টা করেন। অন্য ধর্মের প্রতি ইহা করিবার সাহস তাঁহাদের নাই।

বনশালি সাহেবকে যদি নির্ভেজাল প্রেমকাহিনি লইয়া চলচ্চিত্র নির্মাণ করিতে হয় তাহা হইলে আলাউদ্দিন খিলজির কন্যা ফিরোজা, ঔরঙ্গজেবের কন্যা ও নাতনি, ইলতুতমিসের কন্যা যাঁহারা হিন্দুরাজা বা রাজপুত্রের প্রেমে পড়িয়াছিলেন তাহাদের লইয়া চলচ্চিত্র নির্মাণ করিলে খুবই সুন্দর হইবে না কী? প্রকৃতপক্ষে ইহা করিবার সাহস তাঁহার নাই।

বিক্ষোভকারীদেরও মনে রাখিতে হইবে আন্দোলনের নামে নাক বা মাথা কাটিয়া লইবার মতো উগ্রতা দেশবাসীর পছন্দ নহে।

সুভাষিতম্

আপৎসু কিং বিষাদেন সম্পত্তৌ বিস্ময়েন কিম্।
ভবিতব্যং ভবত্যেব কর্মণামেষ নিশ্চয়ঃ।।

বিপদে বিষাদ কেন, সম্পদে অহংকার কেন? যা হওয়ার তা হবেই। —এটাই কর্মের পরিণাম।

ঐতিহাসিক প্রস্তাব সুইস সংসদে

সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের তথ্য জানতে পারবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কালোটাকা উদ্ধারে আরেক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। গোপন থাকবে না সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের আর কোনও তথ্য। সুইজারল্যান্ডের সংসদের উচ্চকক্ষের মুখ্য প্যানেল 'দ্য কমিশন ফর ইকনমিক অ্যাফেয়ারস অ্যান্ড ট্যাক্সেস অব দ্য কাউন্সিল অব স্টেটস' সম্প্রতি প্রস্তাব পাশ করেছে যে সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে দু'দেশ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় তার তথ্য বিনিময় করতে পারবে। গত ২ নভেম্বর এই প্যানেলের শেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে গোপনীয়তা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেই আইন কার্যকর করা হবে। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত থেকে বেশ কিছুটা সরে এসে নতুনভাবে প্রস্তাব এনেছে সুইজারল্যান্ড সংসদের উচ্চকক্ষ। ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া শীতকালীন অধিবেশনে এই প্রস্তাব পেশ করা হবে।

তবে শুধু ভারত নয়, বিশ্বের অন্যান্য চল্লিশটি দেশের বিষয়েও এই প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবের আলাদা কার্যকারিতা রয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন। একশ্রেণীর ভারতীয় কর-ফাঁকি দিয়ে সুইস ব্যাঙ্কে প্রভূত টাকা জমা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মূলত বিগত জমানায় আর্থিক অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এদেশের বিপুল বিত্ত বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ নিয়ম অনুযায়ী তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম, ঠিকানা বা অন্য যে কোনো তথ্য গোপন রাখা হয়।

গত বছর কালোটাকা উদ্ধারে ভারত সরকার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেয় পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে। একইভাবে বিদেশে গচ্ছিত কালোটাকা উদ্ধারেও সচেষ্ট হয় মোদী সরকার। সেই মতো সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ভারতও স্বয়ংক্রিয় তথ্য বিনিময়ের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি মেনেই 'গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ফর দ্য অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অব্ ইনফরমেশন'-এর বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেদেশের কিছু রাজনৈতিক দল ভারতের সঙ্গে এধরনের চুক্তির বিরোধিতা করে সংসদেই।

কিন্তু এখানেই ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য যে সুইজারল্যান্ডের ন্যাশনাল কাউন্সিলে এই বিরোধিতা প্রত্যাখ্যাত হয়। সেখানকার কমিটি অন ইকোনমি অ্যান্ড রয়্যালটিজ অব দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিলও ভারতের পক্ষে সায় দেয়। গত সেপ্টেম্বরে সুইস সংসদের নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া প্রস্তাবে বলা হয়েছিল আগামী বছর থেকে ভারত-সুইজারল্যান্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য বিনিময়ে প্রক্রিয়া শুরু করবে এবং তা পুরোদমে কার্যকর হবে ২০১৯ সাল থেকে। সবমিলিয়ে ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কালোটাকা উদ্ধারে যে লড়াই শুরু করেছে তার নানারকম সাফল্যের মধ্যে বড়ো সাফল্য হয়ে রইল সুইস সংসদের ব্যাঙ্কের তথ্য বিনিময়ের প্রস্তাব।

নিরাপত্তা বাহিনীর সাফল্য : এক বছরে ১৯০ জঙ্গি খতম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছর কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি বড়োসড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে ১৯০ জন জঙ্গি, যাদের মধ্যে ১১০ জন পাকিস্তানি। শ্রীনগরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৫ নং সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল অফিসার ইন কম্যান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে.এস. সান্ধু জানান, এ বছর নিরাপত্তারক্ষীরা নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর জঙ্গি অনুপ্রবেশের অনেকগুলি প্রয়াস রুখে দিতে সমর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, 'নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করার সময় ১১০ জন বিদেশি (পাকিস্তানি) জঙ্গির মধ্যে ৬৬ জন নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মারা গেছে। শুধু কাশ্মীরেই ১২৫-১৩০ জন জঙ্গিকে নিকেশ করেছে নিরাপত্তারক্ষীরা। জঙ্গি দমনে এই

লেঃ জেঃ জে এস সান্ধু

সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।' তাঁর মতে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় 'উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন' এসেছে। সেনাবাহিনী, সি আর পি এফ এবং বিশেষ সন্ত্রাস দমন বাহিনীর সম্মিলিত প্রয়াসেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করছেন।

নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বিমুখী কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, নাশকতামূলক কাজকর্ম ছেড়ে যেসব জঙ্গি সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চান প্রশাসন তাদের সুযোগ দিতে চায়। প্রশাসন এবং বাহিনীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই মাজিদ ইরশাদ খান নামের এক জঙ্গি লস্কর-ই-তৈবায় যোগ দেবার এক সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে।

মাজিদ ইরশাদ খানের উদাহরণ দিয়ে জে.এস. সান্ধু অন্য জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক জঙ্গিকে সম্মানের সঙ্গে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে।

রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্যান্য সংস্কারের পথে এগিয়ে যাবে সরকার : অরুণ জেটলি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমেরিকান মূল্যায়ন এজেন্সি 'মুডির' আর্থিক বাণিজ্যিক ও সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থানে ইতিবাচক ঊর্ধ্বগতির কথা ঘোষণাকে দেশের অর্থমন্ত্রী 'বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া' বলে আখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে দেশে চলতি বড়সড় সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর কেন্দ্র আরও কিছু আবশ্যিক সংস্কারে হাত দেবে। অবশ্যই রাজস্ব ক্ষেত্রে সংহতি সাধনের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চালু থাকবে।

সরকারের তরফে গত তিন বছরে নেওয়া বিভিন্ন সাহসী ও সদর্থক সংস্কারের ভিত্তিতেই যে মূল্যায়ন সংস্থা এই আপগ্রেডেশন (ঊর্ধ্বায়ন) ঘটিয়েছে তা জানাতে ভোলেননি জেটলি। এ প্রসঙ্গে তিনি জিএসটি, অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ধাঁচায় পরিবর্তন ঘটানো, বিমুদ্রীকরণ, ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে পুনর্মূলধনীকরণে, আধারের ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সরকারের

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা থেকে ডিজিটাইজেশনের ব্যাপক উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার কথা বলেন।

দীর্ঘ ১৪ বছর পরে প্রখ্যাত মূল্যায়ন সংস্থার তরফে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই ঊর্ধ্বায়নের ঘোষণা দেশের শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে বলে জেটলি জানান।

এই সূত্রে জেটলি বলেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলি নিয়ে এতদিন যারা বিদ্রূপ করে আসছিলেন তাঁদের এবার আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। বিরোধীদের এই মূল্যায়নের ফলে গুজরাট নির্বাচনে বিজেপির রাজনৈতিক সুবিধে নেওয়ার কথা উড়িয়ে দিয়ে জেটলি বলেন সবসময় নির্বাচনী ফলাফলের মুখাপেক্ষী হয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত নিতে গেলে দেশের মঙ্গল সাধনে কোনো বড় ধরনের সংস্কারে হাত দেওয়াই যাবে না।

দেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে আরও বর্ধিত বিনিয়োগ করতে সরকার সচেষ্ট হলেও একই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রাজস্ব ঘাটতির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। এ প্রসঙ্গে তিনি খোলাখুলি সরকারের বিগত তিন বছরের রাজস্বনীতি ও তার ফলাফল পর্যালোচনা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চলার ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতি সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লক্ষ্যচ্যুতি যাতে না হয় সে বিষয়ে সরকার সদা সতর্ক।

সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বায়ন সূত্রে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, দেশের সামগ্রিক বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের (Macro economic) স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সরকারের দায়বদ্ধতার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি আজ নিয়ন্ত্রণে, বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি নিম্নমুখী ও বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারে বৃদ্ধি ঘটে চলেছে এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

ভারত ২০১৯ সালের মধ্যেই বিমান উড়ানে বিশ্বে তৃতীয় স্থান দখল করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ভারতবর্ষের এয়ারপোর্টগুলি থেকে ১৫ কোটি যাত্রী বিমানযাত্রা করবে। এর ফলে বিশ্বের বিমান উড়ান ক্ষেত্রে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হয়ে উঠতে চলেছে বলে খবর। সেন্টার ফর এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাভিয়েশন (সিএপিএ) সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে বিশ্বের বিমান ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে শুধু নির্গমনের ক্ষেত্রে নয় আগমন নির্গমন উভয়ক্ষেত্রেই যাত্রী ও ফ্লাইট সংখ্যায় ভারত আমেরিকা ও চীনের পরের স্থানটিই দখল করতে চলেছে ২০২৫ সালের মধ্যে। অবশ্য সিএপিএ-এর সূত্র অনুযায়ী ভারত ২০২২-২৩ সালের মধ্যেই তৃতীয় স্থান দখল করবে। এই হিসেব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে ২৬.৫০ কোটি যাত্রী থেকে এই সংখ্যা ৪৬ কোটি ছুঁয়ে ফেলবে। যাকে বলে 'কোয়ান্টাম জাম্প'। এর মধ্যে অস্বস্তিকর খবর হলো এই বিপুল সংখ্যক বর্ধিত যাত্রীর চাপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় এয়ারপোর্টগুলি সেইভাবে আদৌ প্রস্তুত নয়। এর অর্থ যাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করা, নিরাপত্তা নিরীক্ষণে বিলম্ব, অভিভাসন কাউন্টারে দেরি যার ফলে বিমান ছাড়ার ক্ষেত্রেও দেরি হবে। একই সঙ্গে ভাড়াতেও অনভিপ্রেত বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

ভারতীয় এয়ারপোর্টগুলি আগামী ২০২২ সালের অর্থবর্ষের মধ্যেই তাদের কাঠামোগত বৃদ্ধির সর্বোচ্চ (যাত্রী ধারণ ক্ষমতার) সীমায় পৌঁছে যাবে। বর্তমানে নির্মীয়মাণ এয়ারপোর্টগুলি যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে না শেষ হয় তাহলে ২০২২-এর আগেই এই চরম অবস্থা এসে যেতে পারে।

আধার সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা কখনই লঙ্ঘিত হয়নি : ইউআইডিএআই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ (ইউআইডিএআই), '২১০টি সরকারি ওয়েবসাইট আধার সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে' বলে গণমাধ্যমের একাংশে প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে যে, এই সংবাদে মনে হতে পারে যে আধার-এর তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়েছে অথবা প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের সংবাদে সত্য প্রতিফলিত হয়নি। ইউআইডিএআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, আধার সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রয়েছে, তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়নি।

ইউআইডিএআই তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, উল্লিখিত তথ্যগুলি, তথ্য জানার অধিকার আইনে জনসাধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইটগুলি প্রকাশ্য মঞ্চে এনেছে। এর মধ্যে রয়েছে--- বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য তৃতীয় পক্ষ/ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত আধার সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য তথ্য। এর কোনওটিই ইউআইডিএআই-এর তথ্য ভাণ্ডার অথবা সার্ভার থেকে প্রকাশ করা হয়নি।

ইউআইডিএআই বলেছে যে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/মন্ত্রককে তাদের ওয়েবসাইট থেকে অবিলম্বে এই তথ্যগুলি সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করার জন্যও বলা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে আরও বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে আধার সংক্রান্ত তথ্য এইভাবে প্রকাশ না করা হয়। ইউআইডিএআই-এর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলি থেকে সঙ্গে সঙ্গে এইসব তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে। তবে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরটি এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যাতে এইসব তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে পাঠকরা বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং এর নিরাপত্তা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারেন।

ইউআইডিএআই আরও জানিয়েছে যে, আধারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকমানের এবং আধারের তথ্যগুলি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ওয়েবসাইটগুলিতে যেসব আধার সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ— বায়োমেট্রিক তথ্য কখনই প্রকাশ করা হয় না এবং ইউআইডিএআই-তে সর্বোচ্চ সতর্কতার মধ্যে তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ইউআইডিএআই সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, আধার সংখ্যা কোনও গোপনীয় সংখ্যা নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সির সঙ্গে কোনও বিশেষ ধরনের পরিষেবা বা সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা নিতে হলে তা জানাতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আধার সংখ্যার এই ধরনের ব্যবহার থেকে নিরাপত্তা অথবা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র আধার সংখ্যা প্রকাশকে কোনওভাবেই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ভাবা উচিত নয় বা এক্ষেত্রে কোনও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বা প্রতারণার আশঙ্কাও নেই। কারণ, ব্যক্তির পরিচয় যথাযথভাবে যাচাই করার জন্য আঙুলের ছাপ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চোখের মণির ছবি থাকা দরকার। এছাড়াও, যে কোনও ধরনের পরিচিতি যাচাইয়ের ঘটনা সংশ্লিষ্ট পরিষেবাদাতা সংস্থার কর্মীদের উপস্থিতিতেই করা হয়ে থাকে, যার ফলে এই ব্যবস্থাটি নিরাপদ থাকে।

এছাড়া, ইউআইডিএআই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি জনসাধারণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে করা এক ব্যবস্থা। বায়োমেট্রিক তথ্যের চাবিটি ইউআইডিএআই পোর্টালেই থাকে, যা কেবলমাত্র www.uidai.gov.in. ওয়েবসাইট থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোপন চাবি ব্যবহার করেই একমাত্র খোলা সম্ভব।

বাংলাদেশে দিনে পাঁচ শতাধিক হিন্দু দেশছাড়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নানা ছুতোয় প্রতিদিন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। কয়েকদিন আগে রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন লাগানো ও লুঠপাটের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবাইদুল কাদের হিন্দুদের ওপর আক্রমণের কথা স্বীকার করে বলেন, ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্যই হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চলানো হচ্ছে। গত ২১ অক্টোবর কানাডার টরন্টোতে বাংলাদেশ মাইনোরিটি রাইটস অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে ইউকে, রাশিয়া, ইউএসএ, সুইডেন, কানাডা ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সেমিনারে বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচের প্রধান অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যে রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা এখন ক্ষমতায়। তবু ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা, বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন গড়ে ৫ শতাধিক হিন্দুকে প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়তে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ীদের বিচারও হচ্ছে না।

মোদী সরকার বিশ্বের তৃতীয় বিশ্বাসযোগ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বিশ্বের সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য সরকারগুলির মধ্যে অন্যতম— সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী এক সমীক্ষা থেকে উঠে এসেছে এই তথ্য। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)-কৃত একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে বিশ্বের সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য সরকারের তালিকায় মোদী সরকারের স্থান তৃতীয়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডবলিউ ই এফ)-কৃত অন্য একটি সমীক্ষা থেকেও মিলেছে একইরকম তথ্য। সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিশ্বের বিশ্বাসযোগ্য সরকারগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারতের ৭৫ শতাংশ মানুষ মোদী সরকারের ওপর তাদের আস্থার কথা জানিয়েছেন।' নরেন্দ্র মোদীর দুর্নীতি-বিরোধী পদক্ষেপ এবং আর্থিক সংস্কার তাঁর নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে রিপোর্টে। সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এক টুইটবার্তায় বলেন, 'সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। মোদীজীর ন্যায়নিষ্ঠ সরকার পরিচালনার কারণে তাঁরা আবার তা ফিরে পেয়েছেন।' তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড। দ্বিতীয় স্থানে ইন্দোনেশিয়া।

উবাচ

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তাঁর সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল। ভারতে ফুটবল জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তাঁর সহধর্মিণী দীপা দাসমুন্সি-সহ পরিবার ও সমর্থকদের আমি সমবেদনা জানাচ্ছি।"

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির প্রয়াণ প্রসঙ্গে

তসলিমা নাসরিন
বাংলাদেশি লেখিকা

"বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হাকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা চাইছিলেন তিনি ইস্তফা দিন এবং দেশ ছেড়ে চলে যান। এছাড়া তাঁর কাছে আর কোনো বিকল্প ছিল না।"

বাংলাদেশে গণতন্ত্র হত্যা প্রসঙ্গে

সুধীর চৌধরী
জি নিউজ-এর সম্পাদক

"অবাক করার মতো কথা হলো, সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই পদ্মাবতীর নির্মাতারা কয়েকজনকে এই চলচ্চিত্র দেখিয়েছেন। তাঁরা পরিষ্কার করে বলছেন না যে পদ্মাবতী কাল্পনিক না ঐতিহাসিক।"

পদ্মাবতী চলচ্চিত্র ঘিরে বিতর্ক প্রসঙ্গে

সইদ ওয়াসিম রিজভি
শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান

"সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মসজিদ লখনউতে হতে পারে। এটাই দেশজুড়ে একমাত্র শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ সুনিশ্চিত করতে পারে।"

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

চটি পিসির ভাইপোদের দৌরাত্ম্যে বিপন্ন বঙ্গভূমি

আমাদের রাজ্যের চটি পিসির আশীর্বাদে ভাইপোরা ভাল রকম করে কম্মে খাচ্ছেন। চটি পিসির রাজত্বে মা-মাটি-মানুষের স্লোগানটাও ভাইপোরা নিজের সম্পত্তি বলে হাতিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মা-মাটি- মানুষের নামে অনুষ্ঠান হলে তার লাভের গুড় খাবে চটি পিসির আদরের ভাইপোরা। চটি পিসির জয় হোক। তিনি বলে দিয়েছেন এই রাজ্যে ডেঙ্গি রোগে ১৯ জন মারা গেছেন। বাস্তবে মৃতের সংখ্যা শতাধিক হলেও কিছু আসে যায় না। চটি পিসি বলে দিয়েছেন সাংবাদিকরা অকারণে ডেঙ্গি আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। সেটাই ঠিক। যত দোষ সংবাদমাধ্যমের। তারা বিশ্বনিন্দুক। এই যে কলকাতার মহানাগরিক রাস্তার নর্দমায় ব্লিচিং পাউডার ছড়াচ্ছেন সেই ছবি সারাদিন টিভিতে দেখানো উচিত ছিল। এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও সাংবাদিকদের নেই। শুধু ডেঙ্গি ডেঙ্গি করে চেঁচালেই হবে। চটি পিসি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ঘুরলেন প্রবল ঠাণ্ডায় স্রেফ একটা হাওয়াই চটি পায়ে। তারপরেও ঠাণ্ডা পিসিকে কাবু করতে পারেনি। তাঁর সফরসঙ্গী চাটুকার সাংবাদিকরা উল্লসিত। লন্ডনের শীতের ভোরবেলায় হাওয়াই চটি ফটফটিয়ে দশ কিলোমিটার রোজ হেঁটে চটি পিসি যে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন সে কথা আমরা জানতেই পারতাম না যদি না তাঁর চোখের মণি কলকাতার চার সাংবাদিক নিজেদের চোখে দেখা প্রতিবেদন লিখে ডেঙ্গিতে আধমরা বাঙালিকে না জানাতেন। পিসি যে বিলেত থেকে কয়েক লক্ষ কোটি বিদেশি মুদ্রা জ্বরে ভোগা বাঙালিকে চাঙ্গা করতে পশ্চিমবঙ্গে আনার ব্যবস্থা করেছেন, সে কথা এই চারজন চাটুকার সাংবাদিক না জানালে আমরা জানতেই পারতাম না।

এদিকে চটি পিসির ছোট ভাই, ভাইপোরা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অরাজকতা শুরু করেছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর তোলাবাজি গুণ্ডামির প্রতিবাদে একান্ত বাধ্য হয়ে গৌড়বঙ্গের উপাচার্য গোপাল মিশ্র পদত্যাগ করেছেন। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়ার পদত্যাগ এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বিরূপ।

গুরুপুরুষের কলম

অনুরাধার প্রশাসনিক দক্ষতা নেই। এই উপাচার্যরা অবশ্য তাঁদের যোগ্যতায় পদে বসেননি। চটি পিসি তাঁদের তুলে এনে উপাচার্যের কুরশিতে বসিয়ে ছিলেন। চটি পিসি একবার প্রেসিডেন্সিতে একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তখন উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়াকে টিভির পর্দায় রাজ্যবাসী দেখেছিলেন। তিনি চটি পিসির সামনে নতজানু হয়ে গদগদভাবে হাত কচলাছিলেন। সবাই এখন দেখছেন, শুনছেন, পড়ছেন। যাদবপুর আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক কর্তারা সমস্ত সৌজন্যটুকু বিসর্জন দিয়ে লড়াই করছেন কে আগে চটি পিসিকে ডি.লিট দেবে। তথাকথিত শিক্ষাবিদদের এমন চাটুকারিতা অতীতে দেখা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়েছে ব্যাঙয়ের ছাতার মতো। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর নাম আপনারা বলতে পারবেন না যাঁর শিক্ষাজগতে সম্মান আছে। রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই পরিচালকরা তৃণমূলের সক্রিয় সমর্থক। শাসকদলের স্বার্থ দেখাটাই তাদের একমাত্র কর্তব্য। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশুনার সুস্থ পরিবেশ নেই। এ এক অদ্ভুত আঁধার নেমেছে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে।

বাম আমলে শিক্ষাকে পার্টির কবজায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন প্রয়াত অনিল বিশ্বাসমশাই সর্বত্র সিপিএমের ঝান্ডা ধরা কমরেডদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন কমিটিতে বসিয়ে দেন। সরাসরি অনিল বিশ্বাসের নির্দেশে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলতো। সেই বিপন্ন সময়েও জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অথবা অনিল বিশ্বাসমশাইকে ডি.লিট দেওয়ার জন্য যাদবপুর-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাড়াকাড়ি পড়েনি। মুখ্যমন্ত্রীকে শিক্ষার সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার জন্য শিক্ষাবিদদের মধ্যে এমন শেয়াল-কুকুরের ঝগড়া দেখিনি। চটি পিসির বিশেষ আস্থাভাজন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী চাইছেন যে প্রেসিডেন্সিতে আসন খালি থাকলে সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হোক। একদা রাজ্যের সেরা মানের ছাত্রছাত্রীরাই প্রেসিডেন্সিতে ভর্তির সুযোগ পেতেন। প্রেসিডেন্সিতে যাঁরা পড়াতেন তার মান এতটাই উঁচু ছিল যে সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। উচ্চ মেধার ছাত্রছাত্রীরাই সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। অনুরাধা লোহিয়া একদা এই উচ্চমানের প্রেসিডেন্সি কলেজেরই কৃতী ছাত্রী ছিলেন। তিনি যখন যোগমায়া দেবী কলেজের অতি সাধারণমানের ছাত্রী চটি পিসির সামনে নতজানু হয়ে হাত কচলান তখন বুঝতে পারি আমাদের রাজ্যের শিক্ষা জগৎ চটি পিসির দৌরাত্ম্যে আজ বিপন্ন। সরকারি চিকিৎসক, অধ্যাপক, দলদাস পুলিশ, সকলেই চটি পিসির ভাই, ভাইপোদের অত্যাচারে জর্জরিত। আতঙ্কিত। পশ্চিমবঙ্গে এখন সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ নেই। চটি পিসির ভাই, ভাইপোরা বিরোধীদের পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিতে অস্ত্র হাতে ময়দানে নেমে চমকাচ্ছে। বলা হচ্ছে, ব্যালট নয় বুলেট দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট হবে। বন্ধুরা সাবধান!

জ্বরেও জল! জবাব নেই দিদির

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

জ্বর তো হতেই পারে। মশাও কামড় দিতেই পারে। তাতে মৃত্যু হতেও পারে। কিন্তু এত ভয় কেন বলুন তো দিদির?

এখন জ্বর-মামলা আদালতে। আদালতে সরকারের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। মৃতদের নামের তালিকাও বিচারপতিদের হাতে তুলে দেন তিনি। কিন্তু আবেদনকারীরা মৃত্যুর এই সংখ্যার কথা মানতে চাননি। সরকার সঠিক তথ্য চেপে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। তখন সওয়াল করার সময়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল এটাও বলেন, আবেদনকারীরা মিডিয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে মামলা করেছেন। কিন্তু সব মৃত্যু ডেঙ্গিতে কি না, তার প্রমাণ নেই।

কিন্তু মুশকিল হলো আবেদনকারীরা যে তথ্য আদালতে জমা দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে চার জনেরই মৃত্যু সরকারি প্রতিষ্ঠানে হয়েছে। চার জনের ডেথ সার্টিফিকেটেই মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'ডেঙ্গি' লেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের নাম সরকারের পেশ করা তালিকায় নেই। এই গরমিল দেখেই কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ বলে, রাজ্য সরকারের রিপোর্ট কী করে বিশ্বাস করবেন তাঁরা?

যদিও রাজ্য সরকার আদালতে বলার চেষ্টা করে ডেঙ্গি মোকাবিলায় তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অফিসে জমা জলে ডেঙ্গির আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। তারা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। হাস্যকর অভিযোগ। কারণ, ওই মামলাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী দাবি করেন, কেন্দ্র ১৯ কোটি টাকা দিলেও, রাজ্য মাত্র ৫ কোটি খরচ করতে পেরেছে। এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ২২ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি রাজ্য।

ডেঙ্গি মোকাবিলার জন্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে কেন্দ্রীয় টিম রাজ্যে আসার জন্য প্রস্তুত। আদালতের নির্দেশ পেলেই তাঁরা এসে পরিস্থিতি দেখে রাজ্য সরকারের কী কী করা উচিত তার রিপোর্ট দিতে পারে। কেন্দ্র এই ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে চিঠি লিখিলেও, রাজ্য কোনও উত্তর দেয়নি।

কিন্তু বড় কথা হলো, ভারতের মতো ট্রপিক্যাল দেশে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ নতুন কিছু নয়। সেই রোগ এ রাজ্যের কিছু অংশে সত্যিই ভয়ানক চেহারা নিয়েছে, এটা স্বীকার করার মধ্যে কতটা লজ্জা রয়েছে। কেন লজ্জিত দিদি?

শুধুই ডেঙ্গির রক্ত পরীক্ষার ব্যাপারে কড়াকড়ি করলাম, চিকিৎসকদের ধমক দিলাম, সংখ্যার হিসেবে ডেঙ্গিকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করতে হলো না আর রাস্তায় নেমে একটু ব্লিচিং ছড়িয়ে দিলাম, তাহলেই সরকারের কাজ শেষ?

ভবিষ্যতের কথা ভেবে সার্বিক ভাবে জনস্বাস্থ্যের দিকে, বিশেষ ভাবে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ কীভাবে করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। রোগের ও রোগীর উপর দীর্ঘমেয়াদি নজরদারি, সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণার ফলাফল সর্বস্তরের চিকিৎসকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো কাজও দরকার।

কোথায় মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে নিয়ে মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবেন। তা না করে তিনি বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীকে।

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে সবাই বলুন প্লিজ যে— 'এক বর্ষাতেই ডেঙ্গি যায় না।'

—সুন্দর মৌলিক

নোটবাতিলের সুফল দেশ পেতে শুরু করেছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায়শই প্রতি বছর নানান পুণ্যস্নান করার রীতি আছে। বহু মানুষ বিশ্বাস করেন এই অবগাহন স্নানের দ্বারা মানব জীবনের বহু পাপ স্খালন হয়। ২০১৬-র নভেম্বর মাসে দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিগত ৫০ বছরের সব থেকে রোমহর্ষক ও তোলপাড় করে দেওয়া যে 'বিমুদ্রীকরণের' সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল ২০১৭ সালে তার এক বছর পূর্ণ হলো। সরকারি ফাঁদে পড়ে বহু অসৎ উপার্জনের টাকা ব্যাঙ্কে চলে আসায় তস্করদের হয়তো তাই অজান্তেই কিছুটা পাপ স্খালন হলো।

শৈশবে সকলেই চোর-পুলিশ খেলেছেন। তাই সকলেরই জানা যে এই খেলায় একজনকেই বাকি চোরদের খুঁজে বের করতে হয়। সকলেই তো এক জায়গায় লুকোন না, তাই খেলাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে। নোটবন্দি লাগু হওয়ার মধ্যে চোর-পুলিশের আদল থাকলেও প্রথমটি নিছক খেলাই আর বাস্তবের নোটবন্দি ঘাগু কর-ফাঁকিবাজ, অসাধু কারবারি, কালোটাকার মজুতদারদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ। এক বছর হয়ে গেছে বলে বিরোধী এবং স্বপক্ষীয়রা মৃত্যুদিন বা জন্মদিন পালনের প্রতিতুলনা টানলেও অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে এই আকস্মিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। কেননা এ তো মাথার যন্ত্রণা সারাতে অ্যাসপ্রো খাওয়ানোয় গেড়ে বসে থাকা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেমোথেরাপি।

তবে এই অনৈচ্ছিক চোর-পুলিশ খেলায় চকিতে পুলিশের আক্রমণে যারা আনাচে কানাচে ঢুকেছিল তারা অনেকেই বাঁচতে গিয়ে আঘাটায় পড়েছে। সরকারকে ধোঁকা দিতে গিয়ে ৩৫ হাজার সন্দেহজনক অস্তিত্বের কোম্পানি ১৭০০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে। তাদের প্রকৃত পরিচয় আজ সরকারের মুঠোয়। তারা ছটফট করছে। মোদী সরকারের উদ্যোগে অর্থনীতির মূল স্রোতে শামিল হতে পারা জনধন প্রকল্পের আপাত শান্ত ব্যাঙ্ক খাতাগুলিকে হঠাৎ বিমুদ্রীকরণের পর চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু ১২৫ কোটির দেশে লক্ষাধিক ব্যাঙ্কশাখা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রত্যেকটির কোথায় কোথায় আহত অর্থনৈতিক কালোবাজারিরা ঢুঁ মেরেছে, কোথায় তাদের কালো কারখানার নিশান থেকে গেছে তা অন্বেষণ করে নিশ্চিত হয়ে তবেই না পরের পদক্ষেপ! দেশব্যাপী ২৩.২২ লক্ষ খাতায় জমা পড়া সন্দেহজনক অর্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখানে নিশ্চিত বিপদের গন্ধ থাকার সম্ভাবনা।

অনেকেই হয়তো শেল কোম্পানি বললে একটু ঘাবড়ে যেতে পারেন। কেননা গড়পড়তা সৎ মানুষ তো আর এইসব টাকা চুরি, তস্করির সঙ্গে পরিচিত নন। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অনেক দেশে খনিজ তেলের গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। মার্কিন দেশে এমন বিপুল তৈল সম্ভার পাওয়া ইস্তক বিশ্ব তেলবাজারে দাম কমে গেছে। তারা আরবের তেল খুবই কম কিনছে। নোটবন্দির পর অবিশ্বাস্য সংখ্যার ২.২৪ লক্ষ শেল কোম্পানির দোকান উঠে গেছে। মোদীজী সাম্প্রতিক একটি সভায় তাঁর বিস্ময় জানিয়ে বলেছেন কেবল একটি মাত্র কোম্পানির নামে অজস্র ব্যাঙ্কে ২১০০টি অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নোটবন্দির সময়ে ভাষণে বলেছিলেন, যা সম্পত্তির কারবারিদের সকলেরই জানা যে সম্পত্তি কেনাবেচায় প্রথম কথা ছিল 'কিতনা নগদ মে হোগা'? নোটবন্দির পরেই ফ্ল্যাটের দাম বহু জায়গায় ভীষণভাবে পড়ে যায়। অসাধু প্রমোটার ও কালোটাকা সাদা করার কারবারিরা সম্পত্তি কিনে বহু ক্ষেত্রে তা কেবল ফেলে রাখার ফলে ওই অর্থ অর্থনীতির কোনো চলমান প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারত না। তা হলে কালোটাকায় টান পড়ার ফলে ফ্ল্যাটের দাম কমায় উপকার কার হয়েছিল? মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষেরাই বাসস্থান ক্রয়ের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। শুধু কলকাতা করপোরেশনেই কোটি কোটি টাকার বকেয়া কর বাতিল নোটে সংগৃহীত হয়।

যার নদীর ধারে ঘর, যার পাহাড়ের ওপর বাস তাদের বন্যার ভয়, ধস নামার আতঙ্ক নিত্যসঙ্গী। উত্তরপ্রদেশের বসপা নেত্রী নোটবন্দির বেহদ্দ বিরোধী। ঘোষণার পরের দিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধানমন্ত্রীর বাপান্ত করেছিলেন। ১০ নভেম্বর ২০১৭ এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ইডির দপ্তর। বছরভর চলা বিপুল আবর্জনাময় অর্থনৈতিক লেনদেনের মধ্যে থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা তারা এখনও পর্যন্ত শনাক্ত করেছে, যা নোটবন্দির পর সাদা করা হয়েছে। নোটবন্দির সময় ব্যাঙ্ক থেকে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকাই গ্রাহকদের তোলার অনুমতি দেওয়া হোত। কিছু কিছু বিয়ের অনুষ্ঠানকর্তা বিশেষ অনুমোদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত সীমার বাইরে টাকা পেয়েছিলেন। সেখানে কীভাবে এত বিপুল অর্থ সাদা করা হলো তা নিয়ে ইডি চার হাজার মহাত্মার একটি তালিকা করেছে। এর প্রথম দিকেই রয়েছেন মায়াবতী। তিনি এই কালোকে সাদা করার দুর্নীতিতে জড়িয়ে হয়তো আরও কালো হতে চেয়েছেন। লালু পুত্রী মিসা ভারতী যিনি বিয়ের পর এক শৈলেন্দ্র সিংহ না কার পদবি ধারণ করেছেন, তাঁর নামও তালিকাকে কলঙ্কিত করেছে। অবশ্য, বামুনের পুজোয় বা শ্মশানমন্ত্র উচ্চারণে অধিকারের মতো তাঁর এতে জন্মগত অধিকার। তাঁর পিতা জেল থেকে জামিন পাওয়া দাগি আসামি লালু প্রসাদ। টাকাপয়সা বেহাত করায় তাঁদের পারিবারিক নৈপুণ্য সন্দেহাতীত। প্রবল রাজনৈতিক প্রজ্ঞামতী মিসা তাঁর বিশ্লেষণে বলেছিলেন, 'মোদীনে দেশকো লুঠ লিয়া'। যথার্থ!

নোটবন্দি কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বলে ছেড়ে দিলে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি অনুক্ত থেকে যাবে। নোটবন্দির পর ২৬.৬ শতাংশ নতুন করদাতা যোগ হয়েছেন। ১৫-১৬ সালে দেশে কর দিতেন ৬৬.৫৩ লক্ষ লোক। শেষ হিসেব অনুযায়ী তা ৮৪.২১ লক্ষ। এটি একটি সমাজ-মানসিকতা শুদ্ধিকরণ প্রকল্প কেন নয়? চরিত্রগতভাবে

সৎ থাকার, নীতিনিষ্ঠ হওয়ার একটি প্রয়াস যে শুরু হয়েছে— স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই সময়ে করদাতার সংখ্যায় এমন বৃদ্ধি— তাই প্রমাণ করে না কি?

বিরোধীরা হুঙ্কার দিচ্ছে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদে প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কালোটাকার দাপট কমাতে নোটবন্দি ব্যর্থ হয়েছে। সদ্য প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় সন্ত্রাসীদের পাথর ছোড়ার ঘটনা ৯০ শতাংশ কমে এসেছে, বলেছেন জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি বৈদ্য। বৈদ্য বলেন, পুলিশবাহিনীকে আক্রমণের ঘটনায় এমন বড়সড় কমতির একটি বড় কারণ বিমুদ্রীকরণের মাধ্যমে জঙ্গিদের মজুত টাকার জোগান কমিয়ে দেওয়া। তাদের তহবিলে ঘাটতি হয়ে যাওয়ায় উপত্যকায় এখন শান্তির পরিবেশ ফিরে আসছে। নোটবন্দির সামাজিক সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষের তরফে আয়কর দপ্তরে জানানো ৯২টির মধ্যে ৮৪টি অভিযোগ যার সঙ্গে ৪০০ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন জড়িত তা সিবিআই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সরকারি-কর্তা সহ ৩০৭ জন ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

মোদী তাঁর ২০১৬-র ৮ নভেম্বর ভাষণে গভীর আবেগে বলেছিলেন, 'দেশের ইতিহাসে এমন একটা সময় আসছে যখন জনগণ এতে অংশ নিতে পেরে গর্ববোধ করবে, দেশ গঠনে অবদান রাখবে। কিন্তু এই ধরনের মুহূর্ত খুব বিরল...।' দুটি উদাহরণের মধ্যে প্রথম মুহূর্তটি কেন বিরল তা বোঝাতেই ১৯৭১ সালে ফিরে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার নোটবাতিল প্রস্তাব খারিজ করার কথা বলা দরকার। রাজ্যসভায় কংগ্রেসের আনন্দ শর্মার আক্রমণের মোকাবিলায় মোদী বলেছিলেন সব দলই এই ধরনের চরম পদক্ষেপ নিতে গেলে ভয় পায়। জাস্টিস ওয়ানচুর রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭১-এ তখনকার অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি চৌহান শ্রীমতী গান্ধীর কাছে হাই ডিনোমিনেশন নোটবাতিলের প্রস্তাব দিলে তিনি পত্রপাঠ বলেছিলেন 'কংগ্রেস কি আর নির্বাচন লড়বে না?' অর্থাৎ অপ্রিয় সিদ্ধান্ত তিনি গদি হারাবার ভয়ে নিতে পারেননি (ঘটনাটি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মাধব গোডবলের 'My years with Chavan' গ্রন্থে উদ্ধৃত)। আজ গুজরাটের সুরাটের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নাকি চরম মোদী বিরোধী। তাঁরা হাজারে হাজারে মিছিল করছেন, বিজেপিকে ভোট দেবেন না। সকলেই সুবিদিত বিজেপি'র আদি ভোটব্যাঙ্ক কিন্তু সবরকমের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। সেই অর্থে তাহলে মোদী দলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বার্থ আগে দেখেছেন। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেশকে সব কিছু বাজি রেখে নিষ্কলঙ্ক করতে চেয়েছেন। সদ্য ভারত 'কারবার করার স্বাচ্ছন্দে'র তালিকায় শততম স্থানে উঠে আসার ক্ষেত্রে অর্থনীতির এই শুদ্ধিকরণ বড় ভূমিকা নিয়েছে। নোটবন্দির পরে পরেই দেশে নগদ লেনদেনের হারকে কমিয়ে যাতে কর ফাঁকি বন্ধ করা যায় সেই লক্ষ্যে নগদের মজুত কম থাকায় ডিজিটাল লেনদেন— কার্ড, পেটিএম, অনলাইনে কাজ বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছিল। জোগান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কমলেও মানুষের অভ্যাসে বিশেষ করে তরুণ সমাজে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে। ২০১৬-র নভেম্বরের থেকে বিনা নগদে লেনদেনের হার এখন অনেক শতাংশ বেশি। জিডিপি'র সঙ্গে নগদ জোগানের যে শতাংশের হার থাকে তা ২০১৬'র নভেম্বরের ১২ শতাংশ থেকে চলতি বছরে চোখে পড়ার মতো স্বাস্থ্যকর ৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

এপ্রিল-জুনের ত্রৈমাসিক জিডিপি বৃদ্ধি ৫.৭১ শতাংশে নেমে আসায় যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে তা আসলে দেশের মঙ্গলের কথা ভেবে নয়, শুধুই বিমুদ্রীকরণকে খাটো করে নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষতিজনিত আক্রোশ মেটাতে। ১৯৭১ সালে শ্রীমতী গান্ধী যে সময় বিমুদ্রীকরণ-প্রস্তাব বাতিল করেছিলেন তখন দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ০.০৯ শতাংশ। তখন কেউ ঘুণাক্ষরে এসব টেরও পেত না। আগামী কয়েকটি ত্রৈমাসিক জিডিপি-র পরিসংখ্যান এলেই দেশের অগ্রসরমান পরিস্থিতি সামনে আসবে।

ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, মণিপুর থেকে আরম্ভ করে গোল্ডলপাড়া পঞ্চায়েতের উপনির্বাচন হলেও বলা হচ্ছে বিমুদ্রীকরণের পর এ মোদীর অগ্নিপরীক্ষা। অগ্নি, জল, বায়ু, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য সকল পার্থিব স্তরই স্থিতপ্রজ্ঞ মোদী পেরিয়ে এসেছেন, এসব ছেঁদোকথা তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। বিরোধিতার স্তর কোথায় নেমেছে তার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ দিয়ে লেখাটি শেষ করব।

সম্প্রতি গুরগাঁওয়ের এক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের ২০১৬ সালের নোটবন্দির সময়ের একটি কথোপকথন ও ছবি রাহুল গান্ধী বাজারে ছেড়েছেন। যেখানে ওই সৈনিক কান্নাকাটি করে নোটবাতিলের নিন্দা করছেন। অথচ গত ৮.১১.১৭ তারিখে টিওআই কে শ্রীলাল (ওই সৈনিক) জানিয়েছেন, ''প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও আমি সরকারের সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাই। আমি ২০ বছর সেনাবাহিনীতে থেকে দেশের সেবা করেছি। এই সরকারের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আমার কান্নার যে ছবি দেখানো হয়েছে তা এক মহিলা জোরে আমার পা মাড়িয়ে দেওয়ার কারণে...।''

এই হলো হবু প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্যকলাপের নমুনা। দ্বিতীয় যিনি কাজে চরম মুসলমান তোষণকারী হয়েও জন্মসূত্রে মুসলমান বিরোধী (বাল ঠাকরে এক সময় দিলীপ কুমারকে দেশ ছাড়বার কথা ভাবতে বলেন) দল শিবসেনার ডেরায় ঘুরছেন যদি ছলে বলে কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে ঢোকা যায়, তাঁর দলের ক্ষেত্রে এখন সেই ভিখারির গল্পটি খুব খাপ খায়। এক ভিখারি বাড়িতে ভিক্ষে নিতে এলে কেউই সামনে আসছে না অথচ ভেতরে দুই মহিলাতে খুব ঝগড়া হচ্ছে। হঠাৎ একটি ছোট ছেলে দরজায় আসাতে ভিখিরি বলল ভিক্ষে কি পাব না? ছেলেটি বলল 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও মা আর ঠাকুমার মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে বাড়ির মালিকানা নিয়ে। ফয়সালা হলে যার বাড়ি সেই ভিক্ষে দেবে'।

এখন 'বিশ্ব বাংলা', 'জাগো বাংলা' নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাতে দিল্লি ছেড়ে 'শুধু বাংলা' নিয়ে থাকাই নিরাপদ, কেননা বিমুদ্রীকরণের সুফল দেশবাসী ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে নতুন করে লোক খেপাবার মতো কিছু আর পড়ে নেই।

নোটবাতিল আর্থিক সংস্কারে একটি সাহসিক পদক্ষেপ

কে. এন. মণ্ডল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজারে চালু থাকা ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর রাত ৮টায় বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুকৃত মোট টাকার ৮৪ শতাংশ বাতিলের আওতায় আসে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে বাতিল হওয়া নোট জমা দিতে জনসাধারণকে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তবুও মানুষের ক্ষোভ-দুর্ভোগ কখনো বিক্ষোভে পরিণত হয়নি— শত উস্কানি সত্ত্বেও। এর একটাই কারণ— মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেছেন, নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। দেশের অর্থনীতিতে বিপুল ও সমান্তরাল কালোটাকার রমরমা, প্রোমোটার ও অসৎ ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকির রাস্তা এবং বাজারে জালনোট ছড়িয়ে ভারতীয় অর্থনীতি ধ্বংস করার দেশি-বিদেশি প্রয়াস তথা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে কালো ও জালটাকার জোগান বন্ধ করতে হলে দেশের স্বার্থে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া সময়ের দাবি ছিল। আর প্রধানমন্ত্রী তাতেই সাড়া দিয়েছেন। অনুমান করা হয়েছিল— এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত রাজনীতির স্বার্থে বিরোধীরা স্বাগত না জানালেও হয়তো গণবিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে বিরোধিতা করবে না।

ব্যক্তি জীবনে এবং রাজনীতিতে ঝুঁকি নেওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত সততা এবং রাজনৈতিক দৃঢ়তা এই সাহসের উৎস। নইলে স্বাধীন ভারতে ১৯৭৮ সালে মোরারজী দেশাইয়ের আংশিক বিমুদ্রীকরণের পরে আর কোনো সরকার এই দুঃসাহসিক পথে পা বাড়াননি। অর্থনীতিবিদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন তাঁর ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় এ ধরনের পদক্ষেপের কথা ভাবলেও নানা কারণে তা কার্যকর করা হয়নি। নোট বাতিলের ঘোষণা হওয়ার পরেই তিনি এই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। যদিও সোনিয়ার চাপে পরবর্তীতে তিনি মত পাল্টান। একথা ঠিক নোটবাতিলের পরে ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের চাহিদামত টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নতুন ছাপা হওয়া ৫০০/১০০০ টাকার নোটের সাইজ অনুসারে এটিএমগুলির হার্ডওয়ার পাল্টাতে একটু সময় লাগায় মানুষের দুর্ভোগ অনেকটা বেড়েছিল। অধিকন্তু, ব্যাঙ্কের শাখায় টাকা তুলতে যাওয়া-আসার পথে কয়েকজন অশক্ত-অসুস্থ লোক মারা যাওয়ায় রাজনীতির কারবারিরা জনরোষ উসকে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং নোট বাতিলের সিদ্ধান্তটি ভুল প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু সাধারণ মানুষ নোটবাতিলের সিদ্ধান্তকে কালোটাকা এবং জালটাকার উৎসের উপর আঘাত বলে মনে করেছেন।

নোটবাতিলের বিরোধিতার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে রাজনৈতিক দলগুলির ভোটের টাকার জোগানের উপর আঘাত, যার উৎস কালোটাকা। নেতা-মন্ত্রীরা নানাভাবে যে উৎকোচ গ্রহণ করেন (ঘুষ নেওয়ার ছবিও দেখা যায়), ব্যবসায়ীরা গোপনে বা সদরে যে অনুদান দেন তার উৎসও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই কালোটাকা। এছাড়াও ঘুষখোর সরকারি কর্তা, কর ফাঁকি দেওয়া ব্যবসায়ী, প্রোমোটার এবং জমি-বাড়ির দালালেরা যে কোটি কোটি কালোটাকা নাড়াচাড়া করেন তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাদের ব্যবসায় আঘাত পড়েছে। ফলে সাময়িকভাবে কিছু লোক কাজ হারিয়েছেন। যাদের পক্ষে বাতিল হওয়া নোট ধরা পড়ার ভয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা করা সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে বেনামে টাকা জমা করতে হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে তারাও। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, নোট বাতিলের পরে Real Estate ব্যবসায় ভাটা পড়েছে। ফলে জমি-বাড়ি বা ফ্ল্যাটের দাম প্রায় ২০-২৫ শতাংশ কমেছে। ইতিমধ্যেই ১২ কোটি টাকার জালনোট ধরা পড়েছে। আয়কর দপ্তর ২.৯ লক্ষ কোটি কালোটাকা চিহ্নিত করে ১ লক্ষ ব্যক্তি ও সংস্থাকে নোটিশ পাঠাচ্ছে। এসব ব্যাপারে যারা তদন্তের আওতায়, তারা কি চুপ মেরে থাকবে আর পিছনে রাজনীতির দাদা-দিদিরা থাকলে মাভৈঃ--- জেলে পুরলেও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করবে।

অনেকেই বলছেন, নোট বাতিলের ফলে জনসাধারণ যে কৃচ্ছসাধন করলেন তাতে লাভ কী হলো— বাতিল নোটের ৯৮ শতাংশ ফের ব্যাঙ্কে জম পড়ল। এত টাকা ব্যাঙ্কে ফিরে আসার কারণ, কালোধনের কারবারিরা নানা পন্থায় স্বনামে-বেনামে এমনকী জনধন প্রকল্পে খোলা জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টেও কয়েক হাজার কোটি টাকা জমা করেছে। এ সব কিছুই আয়কর দপ্তরের নজরে আছে। খবরে প্রকাশ, 'পিনকন' সংস্থাটি নোট বাতিলের আগের কালেকশন দেখিয়ে ৫০০/১০০০ টাকার নোট ডিসকাউন্টে কিনে বহু কোটি টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে জমা করেছে। রাজস্থানে পুলিশ তদন্তে নেমে এর মূল চাঁইকে গ্রেপ্তার করে জানতে পেরেছে— পশ্চিমবঙ্গের কিছু রাঘববোয়ালও এতে জড়িত। বিপদ বুঝে অনেকে আয়কর ফাইল খুলছে, ফলে আয়কর রিটার্ন গত বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি ব্যক্তিগত রিটার্নের ক্ষেত্রে ২৩ শতাংশ। মোট আয়কর আদায় বেড়েছে ১৫.২ শতাংশ। সর্বোপরি, কালোটাকার যে বিশাল বাজার ভারতীয় অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল— তার দিন শেষ। হিসাববহির্ভূত ওই কালোটাকাও এখন ব্যাঙ্কিং চ্যানেলে এসেছে। ফলে ঋণগ্রহীতারা অনেক সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক ঋণ পাবেন।

পরিশেষে বলা যায়, নোট বাতিলের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়ালেও, অদূর ভবিষ্যতে এর সুফল ফলতে শুরু করবে। প্রধানমন্ত্রীর এই সাহসিক পদক্ষেপ ভারতীয় আর্থিক সংস্কারের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। সারা বিশ্বে এই পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু-মহামারী রাজ্যসরকার নির্বিকার

ডাঃ কিংশুক গোস্বামী

ডেঙ্গু ও অজানা জ্বরের প্রকোপে মৃত্যুর তালিকা রাজ্যে ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে চলেছে। রাজ্য সরকার ডেঙ্গু সমস্যা নিয়ে চাপান-উতোর শুরু করেছে। শিলিগুড়িতে ডেঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও রোগ মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার পৌরসভাকে টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের। সব নিয়ম ভেঙে টাকা দেওয়া হচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদকে। এটা পুরোপুরি বেআইনি। রাজ্যে একদিনেই ৫ জন মারা গেল শুধুমাত্র ডেঙ্গুর আক্রমণে। এই পাঁচজনের মধ্যে কারোর বয়স ত্রিশ পেরোয়নি। ১৪ বছরের আনিসুর রহমান কেষ্টপুরের বাসিন্দা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। NS_1^+ ছিল। ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ লেখা হয়েছে ভাইর‍্যাল সিনড্রোম। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুসারে গর্ভবতী মহিলাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে ডেঙ্গু। গত কয়েকদিন ধরে মর্মান্তিক ভাবে একের পর এক গর্ভবতী মহিলা ও তাদের গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রথম তিনমাস ভাবী মায়ের গর্ভপাত হতে পারে। ভ্রূণের অপরিণত অবস্থায় মৃত সন্তান প্রসব হতে পারে। সন্তান প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের আশঙ্কা থাকবে। বীরভূমের রামপুরহাটের দুজনের রক্তের নমুনায় ম্যাকলাইজা টেস্ট পজিটিভ পাওয়া গেছে। এক মহিলা জ্বর নিয়ে ২৪ অক্টোবর হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন তাঁর অনুচক্রিকার সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। দু'দিনের মধ্যে অনুচক্রিকা কমে হয় ৩০০০০-এর নীচে। পরদিন সকালে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। তাঁর গর্ভস্থ শিশুর কোনো হৃৎস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল না। ৩১ তারিখে মৃত শিশু প্রসব হয়। সিটি স্ক্যান ও এমআরআই করে দেখা যায় ডেঙ্গুর কারণে শিশুটির মস্তিষ্কের একাধিক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত।

তা সত্ত্বেও এলাকার কাউন্সিলার নির্বিকার। তিনি বরং প্রশ্ন তুলেছেন মশার ভৌগোলিক পরিচিতি নিয়ে। তার দাবি জেসমিতা নামের ওই মহিলাকে কামড়েছিল উল্টোডাঙ্গার মশা, কসবা এলাকার মশা নয়। জেসমিতা হালদারের শ্বশুরবাড়ি উল্টোডাঙ্গায়। জেসমিতা হালদারের স্বামীর দাবি কলকাতা পুরসভার ১০৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত কসবার হালতু এলাকার ২২ নং লালবাহাদুর শাস্ত্রী রোডে স্ত্রীর বাপের বাড়ির ৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কালীপুজোর পর থেকে। বাড়ির সামনেই জঞ্জাল জমে থাকে, পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের কখনো সেখানে দেখা যায় না। অভিযোগ শুনেই অনেকটাই সাফাইয়ের সুরে এলাকার কাউন্সিলার মধুমিতা চক্রবর্তীর জবাব, শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে, গোটা রাজ্যই এখন ডেঙ্গু আক্রান্ত। তাছাড়াও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ওই মহিলা উল্টোডাঙ্গায় থাকতেন বেশি। তাকে ১০৬ নং ওয়ার্ডের মশা কামাড়ায়নি। কাউন্সিলারের মন্তব্যে বাসিন্দারা ভীষণ ক্রুদ্ধ। নদীয়ার কাচরাপাড়ার দুজন মহিলা জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন। এদের প্রত্যেকের NS_1^+ ছিল। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হয়েছে মাল্টিঅরগ্যান ফেলিওর। কলকাতার ১নং বরো এলাকার ১৫ হাজার রোগীর রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া পজিটিভ ৩৬৪ জনের। প্রায় ১৪০০ জনের ডেঙ্গুর পরীক্ষায় $I.G.N^+$ বেরিয়েছে। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে আসা মমতা বিবি ওড়িশার কোটি হাসপাতালে ভর্তি। মেডিক্যাল পরিষেবা বেহাল, ডেঙ্গু রোগী এখন ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, আরজিকর, বালটিকুড়ি ESI হাসপাতাল, নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে শতাধিক রোগী ভর্তি। বলা হচ্ছে, ডেঙ্গু নির্ধারণের কিট ফুরিয়ে গেছে। কোনো মেডিক্যাল কলেজের কোনো কর্মীকে শোকজ করা হয়নি বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর। তার মানে সঠিক সময়ে কিট ফুরিয়ে যাওয়ার কথা স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়েছিল তবুও কিট পেতে দেরি হচ্ছে। একজন ডাক্তারের কথায় কিটের যা দাম ও কেনার প্রক্রিয়া যতটা সরল তাতে এই বস্তুটি পেতে অসুবিধার কোনো কারণ নেই। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা চাপা দিতে কিট সরবরাহে সরকার ঢিলেমি করছে বলে সন্দেহ।

সাগর দত্ত, বসিরহাট, বিধাননগর মহকুমা, বারাসাত— উত্তর চব্বিশ পরগনার এই চার হাসপাতালে ডেঙ্গুর পরীক্ষা হচ্ছে। দেগঙ্গায় জ্বর মহামারী আকার ধারণ করেছে কিন্তু সেখানে রক্ত পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। এক সরকারি চিকিৎসকের স্ত্রীর র‍্যাপিড টেস্ট (--) করা হলো, কিন্তু অ্যালাইজা টেস্টের পরিবর্তে র‍্যাপিড টেস্টে ডেঙ্গুর পরীক্ষা কেন হলো সেটা চিন্তার কারণ। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও, হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ, রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে স্মারক লিপি দান ও গত সপ্তাহে তিনটি জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে চলছে। মামলাগুলি করেছেন যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি একজন ইতিহাস গবেষক, হাইকোর্টের একজন আইনজীবী ও চিকিৎসক সেল। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গুর বদলে অজানা জ্বর বা সেপটিসেমিয়া, মাল্টিঅরগ্যান ফেলিওর লেখা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে শতাধিক ডেঙ্গু আক্রান্ত অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর রোগী ভর্তি রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব অভিযোগ করেছেন রাজ্য সরকার অজানা জ্বরের নাম করে ডেঙ্গু আক্রান্তদের সংখ্যা লুকোচ্ছে। এই অবস্থায় সকলে মিলে ডেঙ্গুর সমস্যা নিয়ে ডেঙ্গুর কারণ খুঁজে বের করে এই মহামারীর সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। ■

গণতন্ত্র গুঁড়িয়ে দিয়ে ও সর্বোচ্চ আদালত কবজা করে নোবেল চান হাসিনা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে এবং সর্বোচ্চ আদালতকে কবজা করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান শরণার্থীদের প্রতি 'মানবতার দরজা' খুলে দিয়েছিলেন এই আশায় যে, অন্তত নোবেল শান্তি পুরস্কারের শিকে ছিঁড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে নোবেল শান্তির আলোচনায় আসছিলেন মেরকেল, জার্মানির চ্যান্সেলর। তিনি বড় সংখ্যায় শরণার্থী গ্রহণ করে মানবতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। এই নজির শেখ হাসিনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। উঠে পড়ে লাগেন নোবেল শান্তির জন্যে। প্রয়োজনে 'এক বেলা না খেয়ে হলেও' রোহিঙ্গাদের বাঁচানোর ঘোষণা দেন। ইউরোপ আমেরিকায় সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'মানবতার মাতা' হিসেবে শেখ হাসিনাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নগ্নভাবে চোখে পড়ার মতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নোবেল শান্তি পুরস্কার আসেনি। অগত্যা আরও এক বছরের জন্যে অপেক্ষা। এই এক বছরে কোনদিকে গড়ায় এখন বলা যাচ্ছে না। আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে যে ভয়ঙ্কর রূপে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন তা অতীতের যে কোনো স্বৈর শাসককে ছাড়িয়ে যাওয়ার আভাস দিচ্ছে।

অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনুস অনেক তদবির করে, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের হাতে পায়ে ধরে নোবেল এনেছিলেন— এমন অভিযোগ আছে বিস্তর। পুরো দস্তুর এই ব্যবসায়ী পান নোবেল শান্তি পুরস্কার, শান্তির ক্ষেত্রে ইউনুসের অবদান কী এই নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। ক্ষুদ্র ঋণের জনক বলা হয়েছিল ইউনুসকে, কিন্তু বাংলাদেশের আরেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এই ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি শুধু অর্থনীতিবিদ বা

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র সিন্‌হা

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নরই ছিলেন না, একজন খ্যাতনামা রবীন্দ্র গবেষকও। তিনি দেখিয়েছেন, ক্ষুদ্র ঋণের জনক যদি কাউকে বলতে হয় তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেলের অর্থ থেকে নওগাঁর পতিসরে ক্ষুদ্র ঋণ প্রবর্তন করেন। যদিও কৃষকদের মধ্যে প্রদত্ত অর্থ রবীন্দ্রনাথ কখনো ফেরত পাননি। পতিসরে তিনি কলের লাঙ্গলও দিয়েছিলেন কৃষকদের। কিন্তু ইউনুস ক্ষুদ্র ঋণের নামে নোবেল বাগিয়ে নেন যুক্তরাষ্ট্রের বদান্যতায়। ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কৃষকদের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ বিলি করে আদায়ের নামে নৃশংসভাবে ঘরবাড়ি ভেঙেছে, বাড়ির টিনের চাল খুলে নিয়ে গেছে। জোর করে নিয়ে গেছে গোরু-ছাগলও। ইউনুসের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের হাজার হাজার পরিবার। সেসব খবর বিদেশে পত্রপত্রিকায় যাতে না আসে, ইউনুস সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। শেখ হাসিনা অধ্যাপক ইউনুসের কৌশলই গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পত্রপত্রিকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়ের বিষয়টি প্রচারের আলোয় এনে নিজের দেশে কীভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন, তিনশো নির্বাচিত সংসদ সদস্যের জাতীয় সংসদে (পার্লামেন্ট) ১৫৪ জনকে বিনাভোটে নির্বাচিত করে এনেছেন, এক হাতে জঙ্গিবাদ দমন করছেন, অন্যদিকে জঙ্গিবাদের বীজ বপন করছেন, হেফাজতে ইসলামের মতো জঙ্গি ইসলামি দলকে পাশে নিয়ে রাজনীতির নতুন ছক সাজাচ্ছেন, বিরোধী মত ও দলকে দমন করতে চেষ্টার ত্রুটি করছেন না এবং সর্বোচ্চ আদালতকে কবজা করতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে কীভাবে তাড়িয়েছেন, সব চাপা দিতে তৈরি হয়েছেন হাসিনা। রোহিঙ্গা তাস খেলে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেয়েছেন। একেবারে 'মানবতার মাতা' সেজে রোহিঙ্গাদের বরণ করতে নেমে পড়লেন।

শেখ হাসিনা সর্বশেষ যে ভয়ঙ্কর কাজটি করলেন তা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে বিদায় নিতে বাধ্য করার নানা পদক্ষেপ। সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সর্বোচ্চ আদালতকে এমন এক স্বাধীন ও সার্বভৌম স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন, যা সরকারের অগণতান্ত্রিক পথে যেতে বাধা হয়ে যাচ্ছিল। সর্বশেষ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের মাথার ওপর শেখ হাসিনা খড়্গ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ কথা না শুনলেই চাকরিচ্যুতি। ষোড়শ সংশোধনী প্রথমে হাইকোর্টে বাতিল হয়, পরে আপিলে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সাত সদস্যের আপিল বিভাগ সর্বসম্মত রায়ে ষোড়শ সংশোধনীকে

সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে। পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতি এমন কিছু কথা বলেন, যা শেখ হাসিনা পছন্দ করেননি। নিম্ন আদালত সরকারের কবজায়, উচ্চ আদলতকেও কব্জা করতে উঠে পড়ে লাগে সরকার। সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ওই অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫৪ জনকে বিনাভোটে নির্বাচিত করে আনার মতো বিষয়টিও সিনহার পর্যবেক্ষণে আসে। বিনা ভোটে নির্বাচিতদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নিজেও রয়েছেন। প্রমাদ গোনে সরকার। তাই প্রধান বিচারপতিকে সরাতে আইনজীবীদের একাংশের ভাষায় অস্ত্র ব্যবহার করে ছুটির আবেদনপত্রে সই করানো হয়। ব্যাপারটা তখনই বোঝা গিয়েছিল। প্রধান বিচারপতি বাংলায় যে ছুটির আবেদন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়, তাতে অন্তত পাঁচটি ভুল ছিল, যেটা অস্বাভাবিক। সবাই জানেন, সুরেন্দ্র কুমার সিনহা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, এ ভুলগুলো হওয়ার কথা নয়। তাতেই বোঝা যায়, এই আবেদনপত্র অন্যত্র তৈরি করে আনা হয়, যাতে সিনহা সই করতে বাধ্য হয়েছেন। সংবাদমাধ্যম সেই ছুটির আবেদনটি ছাপিয়েছে। আবেদনপত্রে সিনহা অসুস্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের কাছে একটি লিখিত বিবৃতি দিয়ে যান, যাতে তিনি বলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে আবার ফিরে আসবেন। তার আগে একটা নাটক আছে। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে আপিল বিভাগের অন্য চার বিচারপতিকে বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ জানান। এক বিচারপতি দেশের বাইরে ছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাদের হাতে সিনহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত ১১টি অভিযোগের তালিকা তুলে দেন। ওদিকে প্রধান বিচারপতির কথিত ছুটির অব্যবহিত পরই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। প্রধান বিচারপতি এক বিবৃতি দিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরপরই সুপ্রিম কোর্ট থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, আপিল বিভাগের অন্য বিচারপতিরা দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে সংযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার সিনহার সঙ্গে এক বেঞ্চে আর বসতে রাজি নয়। অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, প্রধান বিচারপতির ফেরা সুদূরপরাহত। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালতও কবজায় এলো। এখন বলা হচ্ছে, ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার জন্যে আবেদন পেশ করা হচ্ছে। সরকারের আশা, সুরেন্দ্র কুমার সিনহার অনুপস্থিতিতে পুনর্বিবেচনার রায় তার সরকারের অনুকূলে আসবে। প্রশ্ন উঠছে, আপিল বিভাগের যে বিচারপতিরা ষোড়শ সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল করেছেন তারাই কি সিনহার অনুপস্থিতিতে পুনর্বিবেচনা করে রায় দেবেন?

ক্ষমতার আসন পাকা করার জন্য এইসব স্থূল কৌশল কি সফল হবে? আওয়ামি লিগ ও শেখ হাসিনা বিএনপিকে উপদেশ দেন জামায়াতকে ত্যাগ করার জন্যে। অথচ আরেক ধর্মান্ধ জামায়াত হেফাজতে ইসলামকে কোলে টেনে নিয়েছেন বিএনপিকে রুখতে। এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন আসেনি। গত কয়েক বছর ধরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা হচ্ছে, তাদের বাড়িঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল হচ্ছে, মেয়েদের অপহরণ করার পর জোর করে মুসলমান করা হচ্ছে— এক ভয়ঙ্কর উদ্বেগ দেশজুড়ে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এসব হামলা ও জবরদখলের পেছনে অন্তত ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে আওয়ামি লিগ নেতাকর্মীদের দায়ী করেছে। পরিষদের অভিযোগ, পুলিশ যখন দেখে হামলা ও জবরদখলের পেছনে আওয়ামি লিগ কিংবা অঙ্গ সংগঠনের কর্তা-কর্মীরা রয়েছেন তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। হিন্দু সমাজের একাংশ এই পরিস্থিতিতে দেশত্যাগকে শ্রেয় মনে করেন। স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সমাজ শেখ হাসিনার ওপর আস্থা হারাচ্ছেন। প্রধান বিচারপতি সিনহার বিষয়টি এই আস্থাহীনতাকে আরও গভীর করেছে। হিন্দু নেতারা বলছেন, বিএনপি-র ওপর সংখ্যালঘুদের কখনো আস্থা ছিল না। কারণ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিএনপি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়ে আসছে। বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে মুসলমান- বাংলায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, সেই লক্ষ্য নিয়েই সংবিধানের ইসলামিকরণ করেন। পরবর্তী সময়েও বিএনপি এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আওয়ামি লিগও এখন সেই পথ অনুসরণ করছে। সংখ্যালঘুরা দাঁড়াবে কোথায়?

সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, প্রধান বিচারপতি সিনহা সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব নিয়ে (কারো একক নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়নি) ষোড়শ সংশোধনীর রায়ে যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন তাতে শেখ হাসিনা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি প্রশাসনে হিন্দু সমাজের কয়েকজন কর্তার পদোন্নতি ও চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির ফাইলে সই করেননি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সংগঠন সংবাদিক সম্মেলন করে এর প্রতিবাদ করেছেন।

ধর্মনির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনে এক কোটিরও বেশি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের আশি শতাংশ ছিলেন হিন্দু সমাজের মানুষ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ কমান্ডে। মুক্তিযুদ্ধে কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা প্রাণ দান করেন। মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামি লিগ। স্বাধীনতার ডাক দেন শেখ মুজিবুর রহমান। সেই আওয়ামি লিগ সংবিধানে জেনারেল এরশাদের আনা 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ধরে রেখেছে। প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে ভাস্কর্য স্থাপন করার পর সেটাকে 'মূর্তি' বর্ণনা করে ইসলামি দলগুলোকে উস্কে দিয়েছে এবং সেই ভাস্কর্য সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। হেফাজতে ইসলামের মতো ধর্মান্ধ দলকে কাছে টেনে নিয়েছে। আওয়ামি লিগ গণতন্ত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছে। পাকিস্তানি আমল থেকে যে ঐতিহ্য আওয়ামি লিগকে পথ দেখিয়ে আসছে, সে ঐতিহ্য আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে বর্তমান নেতৃত্বের হাতে। এর শেষ কোথায় ভবিষ্যতই হয়তো বলবে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

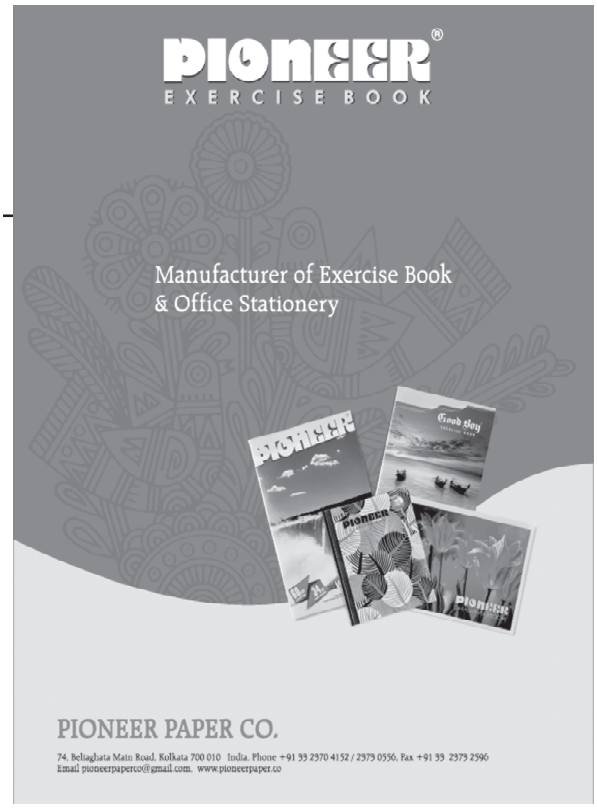

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

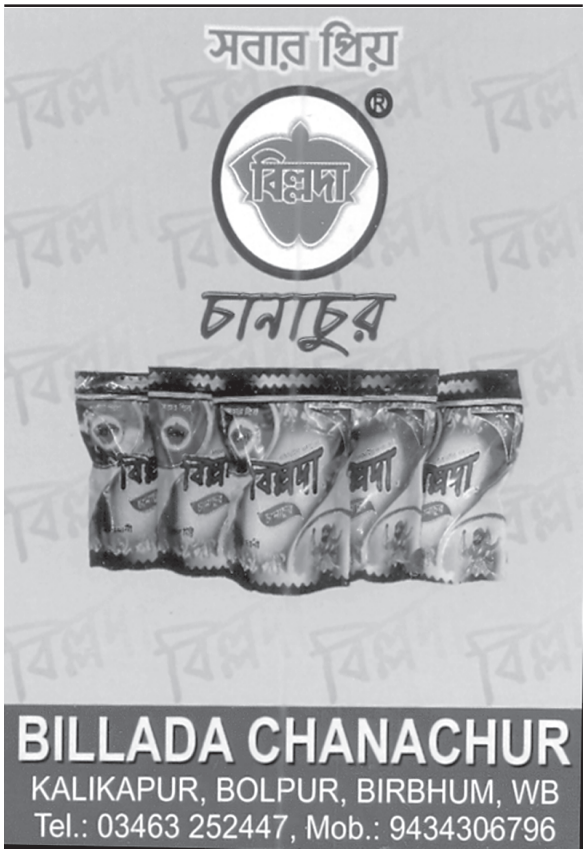

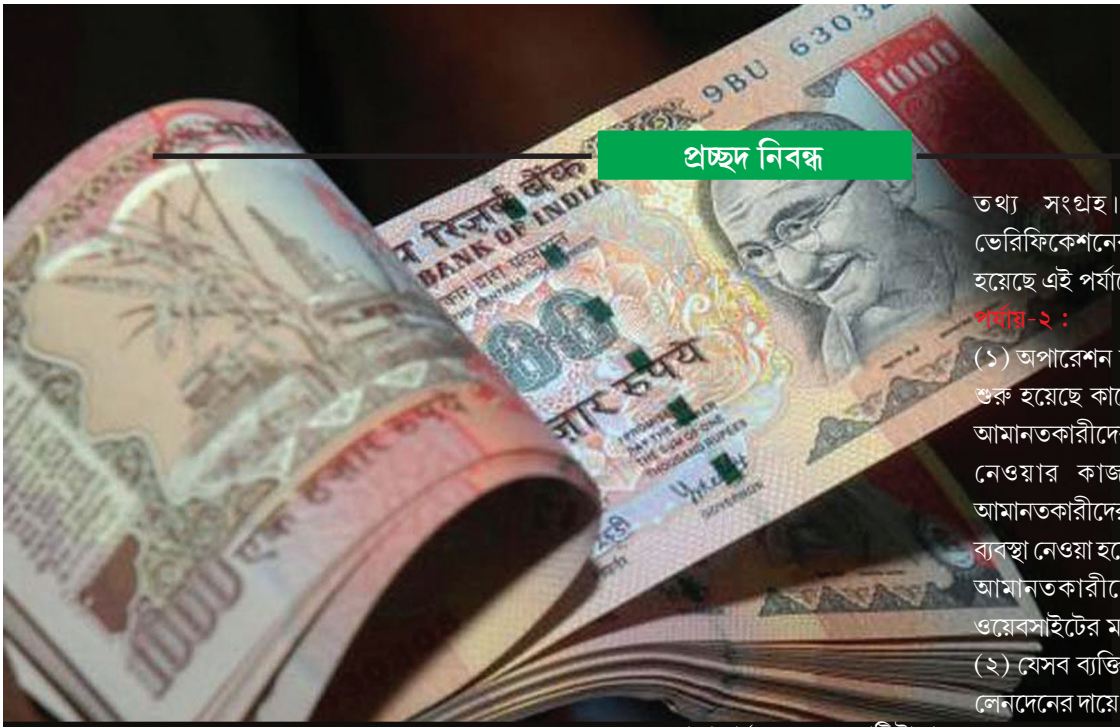

নোটবাতিলের বর্ষপূর্তি

নোটবাতিলের উদ্দেশ্য :

(১) দেশের অর্থনীতি থেকে কালোটাকা দূর করা।

(২) জালনোটের কারবার বন্ধ করা।

(৩) ইসলামি এবং উগ্র বামপন্থী জঙ্গিবাদের মূলে আঘাত হানা ।

(৪) অসংগঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসা যাতে কর ও রাজস্ব আদায় এবং কর্মসংস্থান বাড়ে।

(৫) ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের পরিসরটিকে আরও বিস্তৃত করা যাতে দেশে কম নগদের অর্থনীতি চালু করা যায়।

উদ্দেশ্য সাধনে যেসব পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং তার ফল কী হয়েছে।

কালোটাকার ক্ষেত্রে :

১। নোটবাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর সারাদেশে কালোটাকা ধরার অভিযান বৃদ্ধি পেয়েছে :

(ক) অভিযানের সংখ্যা বেড়েছে ১৫৮ শতাংশ (৪৪৭ থেকে ১১৫২)।

(খ) কালোটাকা বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ বেড়েছে ১০৬ শতাংশ (৭১২ কোটি টাকা থেকে ১৪৬৯ কোটি টাকা)।

(গ) অঘোষিত আয় ঘোষণা করার পরিমাণ বেড়েছে ৩৮ শতাংশ (১১,২২৬ কোটি টাকা থেকে ১৫,৪৯৬ কোটি টাকা)।

২। পাশাপাশি বেড়েছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ :

(ক) বৃদ্ধির পরিমাণ ১৮৩ শতাংশ (৪৪২২ থেকে ১২৫২০)।

(খ) হিসেব-বহির্ভূত আয় থেকে কর আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে ৪৪ শতাংশ (৯৬৫৪ কোটি টাকা থেকে ১৩,৯২০ কোটি টাকা)।

৩। অপারেশন ক্লিন মানি : আয়কর দপ্তর এ বছরের ৩১ জানুয়ারি অপারেশন ক্লিন মানি নামক উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিল। এর উদ্দেশ্য যেসব ব্যক্তির ব্যাঙ্ক-আমানতের সঙ্গে তাদের ট্যাক্স রিটার্নে দেওয়া হিসেব মেলেনি তাদের চিহ্নিত করা। এবং উপযুক্ত তথ্য বিশ্লেষণের পর ব্যবস্থা নেওয়া।

পর্যায়-১ :

(১) প্রথম পর্যায়ে ১৮ লক্ষ ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে শনাক্ত করা হয়েছে যারা ট্যাক্স রিটার্নে কারচুপি করেছেন।

(২) মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে এদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ অনলাইন ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) এই পর্যায়ে সব থেকে বড়ো সাফল্য ৯.৭২ লক্ষ মানুষের ১৩.৩৩ লক্ষ অ্যাকাউন্টে ২.৮৯ লক্ষ কোটি (যার অনেকটাই হিসেব- বহির্ভূত) টাকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। ৩৫০০০ অনলাইন ভেরিফিকেশনের মধ্যে ৭৮০০টি সম্পন্ন হয়েছে এই পর্যায়ে।

পর্যায়-২ :

(১) অপারেশন ক্লিন মানির দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছে কালোটাকার পাহাড় জমানো আমানতকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ। উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন আমানতকারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মধ্য ও নিম্ন ঝুঁকিসম্পন্ন আমানতকারীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

(২) যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সন্দেহজনক লেনদেনের দায়ে অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া চলেছে এই পর্যায়ে। কোনোদিন ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেননি এরকম ১৪০০০ সম্পত্তির (প্রতিটি ১ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের) মালিকের কথা আয়কর দপ্তরের কর্তারা জানতে পেরেছেন।

কর আদায়ে জোয়ার :

(১) ৫ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত ই-রিটার্ন জমা পড়েছে ২.৭৯ কোটি। গত বছর (২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে) জমা পড়েছিল ২.২২ কোটি। অর্থাৎ ৫৭ লক্ষ অতিরিক্ত করদাতা এবছর কর দিয়েছেন। বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫.৩ শতাংশ। এই বৃদ্ধি নোটবাতিলের ফসল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

(২) মোট জমা দেওয়া (ইলেকট্রনিক + পেপার) রিটার্নের সংখ্যা ৫.৪৩ কোটি, যা গতবারের থেকে ১৭.৩ শতাংশ বেশি।

(৩) যারা সদ্য করযোগ্য উপার্জন করা শুরু করেছেন এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে করযোগ্য উপার্জন করলেও কর ফাঁকি দিতেন— এরকম ১.২৬ কোটি নতুন করদাতাকে যুক্ত করা গেছে।

প্রত্যক্ষ কর :

নোটবাতিলের প্রভাবে প্রত্যক্ষ কর আদায় অনেকটাই বেড়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের আওতায় প্রদেয় অগ্রিম কর আদায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের তুলনায় বৃদ্ধি ঘটেছে ৪১.৭৯ শতাংশ। সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স আদায়ে বৃদ্ধি ৩৪.২৫ শতাংশ।

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নোটবন্দি এক মাইলফলক

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহকে অনেকেই মৌনমোহন বললেও সম্প্রতি তাঁকে লক্ষণীয় ভাবে একটু বেশিই কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। আমেদাবাদে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তিনি মোদী সরকারের নোটবন্দির কড়া বিরোধিতা করেছেন। ঐতিহাসিক কয়লা কেলেঙ্কারির কলঙ্ক উন্মোচিত হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে তিনি ফাইল গায়েব হওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'I am not the custodian of files' তিনি নোটবন্দিকে সংগঠিত ও আইনি লুঠ বলেছেন। এর ফলে নাকি ক্ষুদ্র ব্যবসার কোমর ভেঙে গেছে। লাভ হয়েছে চীনের। এমনকী প্রধানমন্ত্রীর বুলেট ট্রেনের পরিকল্পনাকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন। মনমোহন সিংহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ। তাঁর এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোনো আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ পেলে অর্থনীতির একজন ছাত্র হিসেবে অবশ্যই ঋদ্ধ হতাম। কিন্তু তিনি কেবল অর্থনীতিবিদই নন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা শ্রীমান রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দলের এক অনুগত সৈনিকও বটে। সেই আনুগত্যের কাছে তাঁর পাণ্ডিত্য যখন ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভঙ্গিতে নোটবন্দির বিরোধিতা করেন, তখন অবাক হতে হয়।

দীর্ঘ ছয় দশকের কংগ্রেস ঘরানার সঙ্গে তাল দিয়ে অধ্যাপক সিংহও দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার নিয়ে অনেক সাধুবাক্যের জাল বিছিয়েছিলেন। নিলেকানির সাহায্য নিয়ে 'আধার' পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জি.এস.টি.-র প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দেশবাসীকে অবগত করেছেন। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিবার ও কায়েমি স্বার্থের চাপে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার এই অসাধ্য সাধনটি করেছেন শ্রীনরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তাই গত ২০১৬-র ৮ নভেম্বর যে 'চ্যানেল-শোভন' সঞ্চালক ও বিশেষজ্ঞরা এক ঘণ্টার মধ্যেই নোটবন্দির 'প্রিম্যাচিওর অবিচুয়ারি' লিখলো, তারাই আজ কৃষ্ণপতাকা নিয়ে পথে নেমেছে। ইয়েচুরি-মমতা-মনমোহন আজ একাকার।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নোটবন্দি এক

মাইলফলক। সারা দুনিয়ায় এর পক্ষে বিপক্ষে চর্চা চলছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। বিশ্বব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠান এর ফলাফল নিয়ে মূল্যবান ও নিরপেক্ষ মতামত দিয়েছে।

ভারতের স্বাধীনোত্তরকালে আর পাঁচটা সদ্য স্বাধীন ও দরিদ্র দেশের মতো দ্রুত উন্নয়নের প্রশ্নে কৌশল নির্বাচনের (Choice of technique) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অতিনিম্ন অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের একটি দেশকে দ্রুত শিল্পে স্বয়ম্ভর করার জন্য শক্তিশালী সরকারি ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে সোভিয়েত-সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নেহরু সরকার ফেল্ডম্যান-মহলানবিশ মডেলকে গ্রহণ করেছিল। পরিকল্পনার এই আদি যুগে সরকারের শিল্পনীতির প্রশ্নে দেশে দুটি শিবিরের উপস্থিতি ছিল স্পষ্ট। একদিকে নেহরুর সমাজবাদী ভাবনা তথা সোভিয়েত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতি দুর্বলতা, অন্যদিকে মোরারজী দেশাই, কৃষ্ণমাচারী, পিলু মোদী, মিনু মাসানিদের বাজার ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দেশে দুটি ভিন্নমুখী অর্থ ভাবনার সৃষ্টি করেছিল।

সুখময় চক্রবর্তী, অমর্ত্য সেন পরিকল্পনার প্রথম দশকে ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তাত্ত্বিক সাফল্যের কথা বললেও জগদীশ ভগবতী, লর্ড মেঘনাদ দেশাইরা বন্ধ দ্বার, বাণিজ্য বিমুখ পরিকল্পনা ব্যবস্থার সমালোচনায় ছিলেন মুখর।

১৯৬৯-এ ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিশেষ অর্ডিনান্সের মাধ্যমে জাতীয়করণ করে ইন্দিরা গান্ধী যখন বামপন্থীদের সমর্থন পেলেন তখন মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সিন্ডিকেট গোষ্ঠী ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পরিবর্তে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলল। তাঁদের অন্যতম যুক্তি ছিল এর ফলে ব্যাঙ্কের সম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় ও দুর্নীতি বাড়বে। সত্তর দশকের শুরুতেই ব্যাঙ্ক ব্যবসা ছাড়াও সরকার খনি রাষ্ট্রীয়করণের মতো সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ নিয়ে বেশি মাত্রায় অর্থনীতিকে অন্তর্মুখী ও লাইসেন্স কোটার বাঁধনে বেঁধে নির্বাচনী জনপ্রিয়তার পথে হাঁটে।

পরবর্তীকালে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বজুড়ে বাজার অর্থনৈতিক সংস্কার যখন গতি পায়, চীনের মতো দলতন্ত্রের দেশও ১৯৭৮-এ যখন মুক্ত কচ্ছ ধনতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে তখন

ইন্দিরা গান্ধীর ভারত উল্টো পথে হাঁটে। অবশেষে নরসিংহ রাও-মনমোহন সিংহ জুটি যখন বিশ্ব অর্থনীতির দেওয়াল লিখন অনুসরণ করল তখন সংস্কার আর পছন্দের বিষয় থাকলো না, হয়ে উঠল অপরিহার্য। মূলধনের বেআইনি বহির্গমন থেকে শুরু করে ঋণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ততদিনে গৌরী সেনের ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে যার পরিণতি বর্তমানে সাতলক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ। এর ৯৯ শতাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দেওয়া। এটিকে তাত্ত্বিক ভাষায় বলা হচ্ছে নন পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA)। এই ঘটনাটিকে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়ম Twin balance sheet বলে বর্ণনা করেছেন যা ব্যাঙ্ক ও কোম্পানি উভয়েরই সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর।

দ্বিতীয় ইউপিএ-র সময়কালে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে প্রথম সারির পদমর্যাদায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে বড়ো মাপের একাধিক দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ পায়। এসব ক্ষেত্রে কেবল শিক্ষাগত অযোগ্যতাই নয়, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নেও একশোতে দশ পাওয়া ব্যক্তিরা চল্লিশ পাওয়াদের অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত পদে বসে। এদের দৌলতেই সাহারা পরিবার, বিজয় মাল্যদের সাফল্য। বলা বাহুল্য এরা হিমশৈলের এক-একটি চূড়ামাত্র।

যে বিষয়টা বোঝার তা হলো নোটবন্দি ছাড়া জিএসটি সাফল্য লাভ করতে পারে না। এ দুটো একে অপরের পরিপূরক। তা না হলে দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিমাণ কমবে না। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিলগিজ তাঁর On Selective Indirect Tax Reforms in Developing Countries-এ দেখিয়েছেন ভ্যাট (যা জিএসটি-র পূর্বসূরী) কেমন ভাবে দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ও সেই সঙ্গে কালোটাকার বাড়বাড়ন্ত ঘটায়। ভারত সরকারের অর্থদপ্তর জানাচ্ছে যে জিডিপিতে পরোক্ষ করের অংশ ২০০৫ থেকে ২০১৪-তে ১১ শতাংশে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ২০০৫ সালে চালু হওয়া ভ্যাট এই হারে এতটুকু বদল আনতে পারেনি। গত বছরের নভেম্বরে নোটবন্দি চালু হওয়ার সময় আমাদের দেশে নগদ ব্যবহারের দৌলতে বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্র ছিল। কারেন্সি জিডিপি হার যেখানে ভারতে ১২.৫১ শতাংশ, চীনে তা ৯.৩ শতাংশ, আমেরিকায় ৭.৩ শতাংশ ও নরওয়েতে ২.৪ শতাংশ।

সাম্প্রতিক ব্লুমবার্গ রিপোর্ট জানাচ্ছে, নোটবন্দির ফলে দু' লক্ষ সংস্থার থেকে একশো কোটি ডলার উদ্ধার করা গেছে। ম্যাকিনশের হিসেব মতো যে দেশে কালোটাকার পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ সেখানে এই সংখ্যাটা উপেক্ষণীয় নয়।

এটা ঠিক ভারতের মতো দেশে ইলেকট্রনিক্স মোডে লেনদেন জনপ্রিয় করা

কালো টাকা এখন ছাগলের খাদ্য।

মোটেই সহজ নয়। কিন্তু দিনের পর দিন নেতিবাচক দিকগুলোকে বড় করে দেখে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু না করাটাও এক ধরনের দুর্নীতি। কোনো না কোনো সময় শুরুটা করতেই হবে। উটপাখি হয়ে থাকলে আর্থিক দুনিয়া ক্ষমা করবে না। ইলেকট্রনিক্স মোডে যান্ত্রিক ও স্বচ্ছতা সমার্থক। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার দিকটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিমুদ্রীকরণে বিরোধীদের একটি প্রধান যুক্তি হচ্ছে ১৫.৪৪ লক্ষ কোটি মূল্যের নোট বাতিলের মধ্যে ১৬ হাজার কোটি বাদে সব টাকাই ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। সুতরাং নোটবন্দি ব্যর্থ। ইকনমিক টাইমস জানাচ্ছে, সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্স তিন লক্ষ কোটি বেহিসেবি টাকা উদ্ধার করেছে। এর কারণ কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতিগত গোপনীয়তাই নয়, দু' বছর ধরে জনধন যোজনার মতো নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কারেন্সিকে ব্যাঙ্কবন্দি করাও।

ভারতের অতি নিম্ন ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাতের বাস্তবে এই নোটবন্দি-জিএসটি যুগলবন্দি কেবল ট্যাক্স রেভিনিউ ও করদাতার সংখ্যাই অনেক গুণ বাড়াবে না, পরিকাঠামো উন্নয়নে ও জনকল্যাণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিতে অনেক বেশি শক্তি জোগাবে। গতি আনবে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনার মতো কর্মসূচিতে। দৈনিক ১৩০ কিলোমিটার গ্রামীণ পিচরাস্তা নির্মাণ কর্মসংস্থান সম্ভাবনাকে তরান্বিত করতে বাধ্য। সর্বোপরি ইকনমিক টাইমস কর্তৃক সংগঠিত দশ হাজার স্যাম্পলের সমীক্ষা জানাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর নোটবন্দি ক্ষতিকর বলে মনে করছে মাত্র ৩২ শতাংশ মানুষ।

গত এক বছরে নোটবন্দি ও জিএসটি-র মতো যে দুটি বড় মাপের নীতি প্রণয়নের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে শেষেরটির প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা অনেকেই মেনে নিয়েছে। যদিও এটির প্রয়োগ নিয়ে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু কোনো কাজই শুরু না করলে তার ভালো মন্দ বোঝার অবকাশ থাকে না। এক্ষেত্রে অনেক পেশাদার অর্থবেত্তা চিরবিরোধী Head I win, Tail you loss-এ বিশ্বাসী। যে লোক কিছুই করে না, তার সমালোচনার ভয় থাকে না।

একে মিল্টন ফ্রিডম্যান Tyrany of Statusquo বলেছেন। আমাদের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ভিন্নপথে হেঁটে নিঃসন্দেহে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিছু জ্ঞানপাপী নেতা জনগণের দুর্দশায় সবিশেষ চিন্তিত হয়ে আজ দিশাহারা।

এদেশের আমজনতা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অনুপার্জিত অর্থে বৈভবের আস্ফালন যে দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেখানে কেবল নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কথা মাথায় না রেখে প্রধানমন্ত্রীর একের পর এক চোখে পড়ার মতো সিদ্ধান্তগুলি ভারতবাসী সুস্পষ্ট ভাবে অনুমোদন করছে। তারা বিশ্বাস করে গাড়ি উঁচু গিয়ারে তুলতে হলে গতি কয়েক মুহূর্তের জন্য কমে। ■

নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি এবং অথ কালাদিবস

শেখর সেনগুপ্ত

নোটবাতিলের বর্ষপূর্তি ঘটল ৮ নভেম্বর, ২০১৭। বিরোধী দলগুলি যে যেমন পারছে মোদীজীর নিন্দায় কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে। তারা হরেক কিসিমের আক্রমণ শানাবার প্রয়াসে ব্রতী নানা গলিঘুঁজি থেকে কিছু বাস্তব কিছু কাল্পনিক তথ্যকে তুলে বিজেপি-র পালের হাওয়া কেড়ে নিতে। রাজপথ আর জনপথে যানজট। এখানে ওখানে টুকরো-টাকরা মিটিং, জমাটি মিছিল এবং এভাবেই রাজ্যে উদযাপিত 'কালাদিবস'। একাধিক স্থানে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ হলো— যা এখানকার রাজনৈতিক জমায়েত টানার ও মিডিয়ার ক্যামরাকে টেনে আনবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং কৌশল।

প্রথমেই স্মরণ করি সেই সময়কে, দেশ যখন স্বাধীন হলো। স্বাধীন হলো কী শর্তে এবং কাদের স্বার্থে? শর্ত ছিল মুখ্যত একটাই। আর তা হলো সাম্প্রদায়িকতাকে চূড়ান্ত স্বীকৃতিদান। ওপর ওপর যতই টানাপোড়েন দেখানো হোক, মূল ব্যাপার হলো সম্পূর্ণ দুই ধর্মের বিভাজনকে মান্যতা দিয়ে একটি দেশকে পরিষ্কার দুটো ভাগে ভাগ করা। একটি দেশ চিহ্নিত হবে মুসলমানদের জন্য, অন্যটি হিন্দুদের জন্য। সোজা কথায় এই তত্ত্বে অন্বিষ্ট থেকে যাঁরা দেশকে ভাগ করতে সম্মত হয়েছিলেন মধ্যরাতে তখত দখল করতে, তাঁদের ও তাঁদের উত্তরসূরিদের মুখে আর যাই হোক, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র স্লোগান অত্যন্ত বেমানান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁরাই চেষ্টা করে চলেছেন এক ধরনের মোহময়তার আবহ তৈরি করে আত্মসন্তুষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।

এটা একটা দিক। অন্য দিকটি হলো দুর্নীতি। তখতে বসে প্রথমেই উচ্চারিত হলো, 'তাবৎ দুর্নীতিবাজদের আমরা নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেব।' বাস্তবে দেখা গেল, এরচেয়ে সুচারু মিথ্যাচার দ্বিতীয়টি হয় না। কোটি কোটি মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে কিছু মানুষ রাজনীতিকে ঢাল করে নিজেদের বিলাসবহুল জীবনের চিত্ররূপ নির্লজ্জের মতো প্রকটিত করে তুললেন। একজনের পর একজন প্রধানমন্ত্রী গদিতে আসীন হচ্ছেন, রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীর যা ভূমিকা, তাতে ড. বিধানচন্দ্র রায় সমেত দু'একজনকে বাদ দিলে আদর্শনিষ্ঠার একান্ত অভাব, যুক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থেকে কেবলই ব্যক্তিগত প্রচারের ঢক্কানিনাদ ও পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতিতে সপরিবারে সবান্ধবে আকণ্ঠ জড়িয়ে পড়া। যেখানে নেতা-নেত্রীর এই চারিত্রিক মহিমা, সেখানে লোভাতুর ধান্ধাবাজদের অবাঞ্ছিত বাড়বাড়ন্ত অবশ্যম্ভাবী। সেই সব পঙ্কিল ক্রিয়াকর্মের ক্ষুদ্রাংশমাত্র নিয়ে এযাবৎ দেশ আলোড়িত হয়েছে। একবার পিছন ফিরে তাকান, খানিকটা আভাস তো পাবেন। 'জিপ কেলেঙ্কারি' দিয়ে শুরু করলে 'বোফর্স'কে ছুঁয়ে তা এসে হুড়মুড়িয়ে নামবে কয়লার খনিতে। এদের ক্রমাগত চর্চা করতে থাকলে এক সময় নরকের আত্মঘাতী ক্লান্তি এসে আপনাকে গ্রাস করবে। সেখানে মোদীজীই প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি ওই দুর্গন্ধময় পাহাড়টাকে আঘাত করবার জন্য কিছু পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতেও নেবেন বলে আশা করি। আর তাতেই এতকালের সুবিধাভোগীদের সমবেত আতঙ্ক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে ইতিউতি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। মোদীজীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে সমানে আঘাত হানবার প্রয়াস। তাঁদের যুক্তি বাতিল নোটের ৯৯ শতাংশ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ইত্যাদিতে ফিরে এসেছে। এতো অতি উত্তম কথা। এবার দেখা হোক, কার কার অ্যাকাউন্টে কী পরিমাণ টাকা কী উপায়ে ওই সময়ে জমা পড়ল। অনেক নিম্নবিত্ত মানুষের অ্যাকাউন্টে কীভাবে, কোন কৌশলে, কাদের সহায়তায় লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল, তা নিয়ে এবার আয়কর দপ্তরের সক্রিয় হয়ে ওঠবার সময় আগত। রকমারি ঝোলা থেকে রকমারি বিড়াল বেরিয়ে আসবেই। সন্দেহ নেই, ওই সময়ে ব্যাঙ্ক ও এটিএমের লাইনে দাঁড়িয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু খুব মর্মান্তিক। সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তাই বলে ১০০০ ও ৫০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিনটিকে 'কালা দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করাটা নিছক একটা রাজনৈতিক গিমিক। বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা। ১৫ লক্ষ ২৮ কোটি টাকার বাতিল নোট জমা পড়েছে— যাদের বৃহৎ অংশের উৎস ক্রমে ফাঁস হবে বলেই প্রত্যয়। আর সেই সঙ্গে মনে রাখবেন, ১৬ হাজার কোটি টাকার বাতিল নোট কিন্তু জমা পড়েনি। ওই টাকা কাদের, একটি শিশুও অনুমান করতে সক্ষম।

এবং 'কালা দিবস'। আমাদের দেশের ইতিহাস হাতড়ান। প্রকৃত কালা দিবসের সংখ্যা মিলবে বিস্তর। সেইগুলিকে স্মরণে এনে ধিক্কার দিন। তাতে অন্তত দেশের মানুষের মঙ্গল হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। আমি এখানে মাত্র গুটিকয়েক সম্ভাব্য বাঘা কালা দিবসের বা ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি :

● ধর্মকে ভিত্তি করে দেশভাগের সিদ্ধান্তে যেদিন এদেশের গদিলোলুপ কয়েকজন নেতা সিলমোহর লাগালেন। ● যেদিন ফাঁস হলো ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তরের 'জিপ ক্রয়ের কেলেঙ্কারি'। ● যেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু হলো কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার কারাগারে। ● যেদিন বোফর্স কেরেঙ্কারির কথা সর্বজনগোচরে আসে। ● যেদিন ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ● যেদিন সংসদে প্রশ্ন উঠলেও দেশবাসীকে জানতে দেওয়া হলো না সেই সমস্ত লোকেদের নাম ধাম পরিচয় যাঁরা আদতে বিজয় মালিয়ার পূর্বসূরি— হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেননি। ● সংসদে যেদিন 'কয়লা দুর্নীতি' কালি ছড়ায়।

সম্পূর্ণ তালিকা যদি রচনা করতে বসি, বছরের ৩৬৫ দিনই হয়তো 'কালা দিবস'-এর মর্যাদা পেয়ে যাবে। ■

নোটবাতিলের সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োচিত

অম্লান কুসুম ঘোষ

গত বছরের ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কেটে গেছে একটি বছর। নোট বাতিলের ঘোষণার সময় দেশে ১০০০ টাকার নোট ৬৮৫.৮ কোটি এবং ৫০০ টাকার নোট ছিল ১৭১৬.৫ কোটি। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতিতে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট মিলিতভাবে ছিল মোট ২৪০০ কোটি এবং এর মূল্য ছিল হাজার টাকার নোটে ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার কোটি এবং পাঁচশো টাকার নোটে আট লক্ষ আটান্ন হাজার কোটি টাকা। মিলিত মূল্য পনেরো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ নব্বই হাজার কোটি। মোট চুয়ান্ন হাজার কোটি টাকা জমা পড়েনি। তাহলে বলা যায় প্রায় চুয়ান্ন হাজার কোটি নষ্ট হয়েছে অর্থাৎ অর্থনীতিতে ফিরে আসেনি। এই টাকা জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদনের প্রায় ০.২ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি হলো বছরে প্রায় ১৩০ লক্ষ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকা নষ্ট হলো কিন্তু দেশের মোট উৎপাদন একই রইল। এর অর্থ হলো দেশে টাকার জোগান কমল কিন্তু পণ্য সামগ্রীর জোগান একই রইল। পণ্যসামগ্রীর তুলনায় টাকার জোগান কমার ফলে পণ্য সামগ্রীর তুলনায় টাকার চাহিদা বাড়ল বা টাকার তুলনায় পণ্যসামগ্রীর চাহিদা কম ফলস্বরূপ সমপরিমাণ টাকার বিনিময়ে এখন বেশি পরিমাণ পণ্য কিনতে পাওয়া যাবে। সমপরিমাণ পণ্য কিনতে কম পরিমাণ অর্থ লাগবে অর্থাৎ বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমবে বা মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস ঘটবে, কিন্তু যাদের সাদা টাকায় আয় তাদের আয় কমবে না। তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং ফলস্বরূপ সঞ্চয় ক্ষমতাও বাড়বে। কিন্তু যাদের কালোটাকায় উপার্জন ছিল তাদের উপার্জন এবং এতদিনকার উপার্জনজনিত সঞ্চয় নষ্ট হওয়ার তাদের জন্য খারাপ সময় আসবে। সৎ লোকের সুদিন আর অসৎ লোকের দুর্দিন এরকম এক দিনের স্বপ্নই তো দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছে দেশবাসী। সেই স্বপ্নকে বাস্তব করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, দেশের কালোটাকার পরিমাণ কি তাহলে মাত্র ০.২ শতাংশ আর মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসও কি মাত্র ০.২ শতাংশই ঘটবে? উত্তর না। কারণ, ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন ১৩০ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে প্রচলিত নোটের পরিমাণ মাত্র আঠারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতো। তাই এর মধ্যে চুয়ান্ন হাজার কোটি টাকার নোট নষ্ট হলে দেশে টাকার জোগান কমে প্রায় তিন শতাংশ এর ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে বা বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমবে প্রায় তিন শতাংশ। যদিও এই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস হবে মূলত খুচরো বাজারে যার প্রভাব পাইকারি বাজারে পড়লেও তা খুচরো বাজারের সম শতাংশে হবে না। তাই জাতীয় মুদ্রাস্ফীতির অঙ্কে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পুরোটা না প্রতিফলিত হলেও দৈনন্দিন বাজারে তিন শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের প্রভাব সহজেই নজর কাড়বে।

কালোটাকার দমন করা ছাড়াও নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের একটা বড় সুফল হলো জালনোটের দমন। ভারতের শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চীন ভারতের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করার জন্য ক্রমাগত জালনোট ছাপাচ্ছে এবং নানাভাবে সেগুলিকে ভারতীয় অর্থনীতিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। সেই জাল নগদ অর্থ আইএসআই প্রভাবিত বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠী, চীন প্রভাবিত মাওবাদী উগ্রপন্থী গোষ্ঠীদের রসদ ও অস্ত্র জোগানে সাহায্য করত আর সীমান্ত এলাকার চোরাচালান ইত্যাদি নানান বেআইনি কার্যকলাপে সাহায্য করত।

একথা বলা সম্ভব যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ও বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত সংগঠনগুলিকে জব্দ করে দেশের নিরাপত্তাজনিত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রের উন্নতি করা ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বড় সুফল এনে দিয়েছে এই নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত। কারণ নিয়ন্ত্রণহীন জালনোট ছাপানোর ফলে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছিল, ফলস্বরূপ মুদ্রাস্ফীতি ঘটছিলো এবং অন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটায় সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ না নিত, তাহলে ঠিক কতটা ক্ষতি সাধিত হতো জাতীয় অর্থনীতির এই জালনোট থেকে? উত্তর ভয়ঙ্কর, ইন্টারপোলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ থেকে ২০১৯ এই তিন বছরের মধ্যে সাত লক্ষ কোটি টাকার জালনোট ভারতবর্ষে ঢুকিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিল চীন ও পাকিস্তান। পরিমাণ হিসেবে যা বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত নোটের প্রায় চল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ এই তিন বছরে শুধু জালনোটের কারণে বাড়তি মুদ্রাস্ফীতি হতো চল্লিশ শতাংশ। ■

এই সময়

শাড়ি নিয়ে রাজনীতি

নিউইয়র্ক টাইমসে লেখক আসগর কাদরি লিখেছেন, 'নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর

ভারতে মেয়েদের পশ্চিমি পোশাক ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে শাড়ি।' এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছে সারা দেশ। কেউ বলেছেন, 'অবান্তর'। কেউ বলেছেন, 'আগে লিখতে শিখুন।'

বাপি বাড়ি যা

বাহুবলী সিনেমায় প্রভাস হাতির শুঁড়ে চেপেছিলেন। কেরলের মদ্যপ এক ব্যক্তি

প্রভাসকে নকল করতে গিয়ে সম্প্রতি বিপদে পড়েছেন। হাতিটি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে মাথার ওপর তুলে আবার কী ভেবে যেন নামিয়ে দেয়।

বিরল বাঘ

বিরল প্রজাতির দুটি মালায়ান বাঘের জন্ম হয়েছে প্রাগের চিড়িয়াখানায়। বাচ্চা দুটির

একটি পুরুষ এবং অন্যটি মাদি। আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, মাদিটি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কিনা সেই নিয়ে তাদের সংশয় ছিল। কিন্তু কোনও অঘটন ঘটেনি।

সমাবেশ -সমাচার

উত্তরবঙ্গে একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উত্তরবঙ্গ শাখার দু'দিন ব্যাপী ২২তম একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১১, ১২ নভেম্বর শিলিগুড়ির নিকটস্থ শালবাড়ি প্রকল্প পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। তিরন্দাজি এবং খো খো প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার ১০৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

১১ নভেম্বর সকাল ১০টায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কল্যাণ আশ্রমের উত্তরবঙ্গের সভাপতি সুশীল বেরেলিয়া এবং অখিল ভারতীয় ছাত্রাবাস প্রমুখ নিশিকান্ত যোশী। স্বাগত ভাষণ দেন উত্তরবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমল পুগলিয়া। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ানীতিতে (সরকারি) স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জনজাতি সমাজের প্রতি দুর্লক্ষ্য করা হয়েছে। কল্যাণ আশ্রম গ্রামে গ্রামে একলব্য খেলকুদ কেন্দ্রের মাধ্যমে সেই ভুল পরিমার্জন করে জনজাতি সমাজের মধ্য থেকে ক্রীড়া প্রতিভার অন্বেষণ করে সাফল্যলাভ

করছে। প্রধানবক্তা শ্রী যোশী বলেন, নিত্য নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলন করে সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছোতে হবে। সভাপতি সুশীল বেরেলিয়া তির নিক্ষেপ করে প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ করেন। প্রধান বিচারক ছিলেন, খো-খো-তে সুবোধ ঘোষ এবং তিরন্দাজিতে পুরুলিয়ার মানবাজার থেকে আগত গোপাল শবর। উভয়েই খো-খো ও তিরন্দাজিতে সর্বভারতীয় স্তরে বিবিধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া প্রমুখ সেলাই পূর্তি। এদিন কোচেদের স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেন রাজ্য সভাপতি সুশীল বেরেলিয়া। শিলিগুড়ি তিরন্দাজিতে বেশিরভাগ পদক জিতেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালকরা। খো-খো-তে জলপাইগুড়িকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

১২ নভেম্বর বিকেলে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সহ-সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক লক্ষ্মীরাম টুডু। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সার্বিকভাবে পরিচালনা করে রাজ্য সংগঠন সম্পাদক আশিস কুমার দাস ও শিলিগুড়ি জেলা সম্পাদক মণিকুমার লামা।

উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা ভূপালের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। তিরন্দাজিতে ছেলে ও মেয়েদের তিনটি করে বিভাগ— জুনিয়র, সাবজুনিয়র ও সিনিয়র। শালবাড়িতে গত জানুয়ারি থেকে ৫ জন আবাসিক ছাত্র পড়াশোনার সঙ্গে তিরন্দাজিরও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। সবাই স্থানীয় জনজাতি ছেলেমেয়ে। স্থানীয় তিন মেয়ে সুজিতা ওরাঁ, আরতি ও প্রতিভাও পদক জিতেছে।

এই সময়

আঙুল তোলার জন্য

তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কনভয় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ৫০ বছরের জুলি ব্রিস্কম্যান সাইকেলে

কোথাও যাচ্ছিলেন। ডেমোক্রাট সমর্থক জুলি প্রেসিডেন্টের দিকে আঙুল তোলেন। সামান্য এই ঘটনার জন্য তার চাকরি যায়। প্রতিবাদে ফেসবুকের বন্ধুরা ৭০,০০০ ডলার তুলে দিয়েছেন জুলির হাতে।

ছপ্পড় ফুড়ে

কেউ কেউ সারাজীবন লটারির টিকিট কেটেও পুরস্কার জোটে না। অথচ আমেরিকার

ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা ব্রেন্ডা গেনট্রির ভাগ্য দেখুন, মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে তিনবার টিকিট কেটে তিনবারই জিতলেন ৫০০০,৫০০ এবং ৫ মিলিয়ন ডলার।

হাওয়ার ধাক্কায়

হাওয়া বলে হালকা ভাবে নেবেন না। সম্প্রতি জিফিক্যাট নামের একটি ফেসবুক গ্রুপের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে প্রচণ্ড বেগে

ধেয়ে আসা হওয়া ভারী ট্রাককে পর্যন্ত উল্টে দিতে পারে। ক্রোয়েশিয়ার ট্রাকটি উলটে না গেলেও সেই পরিস্থিতি প্রায় তৈরি হয়েছিল।

সমাবেশ -সমাচার

রায়গঞ্জে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির রক্তদান শিবির

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৮ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুর রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ত্রিশজন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত সঞ্চালিকা শ্রীমতী মুক্তিপ্রদা সরকার।

সিউড়িতে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

গত ১২ নভেম্বর বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের রামকৃষ্ণ সভাগারে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বীরভূম জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অব

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ড. সত্যনারায়ণ মজুমদার। বক্তরা জাতীয়তাবাদী শিক্ষার প্রসারে শিক্ষক সমাজকে অগ্রণী ভূমিকায় সচেষ্ট থাকার কথা বলেন। শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি বামাচরণ রায় জানান জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের এই সম্মেলন ভণ্ডুল করার জন্য শাসকদল নানাভাবে চেষ্টা করে, তা সত্ত্বেও সফল হয়েছে।

বাঁকুড়া সেবা ভারতীর উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

বাঁকুড়া সেবা ভারতীর উদ্যোগে সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার লখ্যাড়া, ক্ষীরপাই, কবিরচক, মুড়লু ও নিত্যানন্দপুরে দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের পোশাক বিতরণ করা হয়। ৫টি গ্রামে

এই সময়

প্রতারিত হবেন না

ইন্ডিয়ান হোটেল অ্যান্ড রেস্টোর‍্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে তারা ৫ শতাংশ

কর নেবে। পাঁচতারা হোটেলে নেওয়া হবে ২৮ শতাংশ। সুতরাং প্রতারিত হবেন না। রেস্তোরাঁর বিল আগে ভালো করে দেখে তারপর টাকা মেটান।

সেচে স্বচ্ছতা

অন্ধ্রপ্রদেশের পালাভারামে বহু প্রতীক্ষিত সেচ প্রকল্প রূপায়ণে অযথা বিলম্ব নিয়ে মুখ

খুললেন বিজেপি নেত্রী দাগ্গুবতী পুরণডেশ্বরী। তাঁর অভিযোগ প্রকল্পের খরচ যে বেড়ে গেছে তা কেন্দ্রকে জানানো হয়নি। প্রকল্প রূপায়ণে আরও স্বচ্ছতা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রসগোল্লা বাংলারই

রসগোল্লা কে প্রথম তৈরি করেছিল, বাংলা না ওড়িশা। এই নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে আইনি

যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। জিআই ট্যাগ পেয়ে শেষ হাসি অবশ্য বাংলা হেসেছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় মুচকি হাসির ছড়াছড়ি। যার অর্থ, ঝগড়া না করে জমিয়ে রসগোল্লা খান।

সমাবেশ -সমাচার

২৪০ জনকে নতুন পোশাক দেওয়া হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সহ সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, জেলা প্রচারক সৃজন কুমার হাজরা, জেলা কার্যবাহ তরুণ কুমার লায়েক প্রমুখ। নতুন পোশাক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন রুমেলা চক্রবর্তী।

অশোকনগরে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ১২ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে স্বস্তিকা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্যোগে এক পাঠক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ১৫০ জন পাঠক ও অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় স্বস্তিকা প্রচার ও প্রসার বিষয়ে পথনির্দেশ

করেন স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। অশোকনগর ও হাবড়া পুরসভা এলাকায় যথাক্রমে ১৩০ ও ১৪০ কপি স্বস্তিকা চালানোর পরিকল্পনা করেন স্থানীয় স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি। স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পাঠকবর্গ। সম্মেলনের প্রধানবক্তা স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেন, ৭০ বছর ধরে বঙ্গভাষীদের স্বস্তিকা পত্রিকা কীভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। সম্মেলন পরিচালনা করেন শ্যামলেন্দু দে।

সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কলাসাধক সঙ্গম

গত ২৮-৩০ অক্টোবর সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কলাসাধক সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয় হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্রে। সম্মেলনে সারা দেশের ৩০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে যথাক্রমে ৮৫ ও ৭৫ জন শিল্পী ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কলাসাধক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, হরিয়ানার রাজ্যপাল ক্যাপ্তেন সিংহ সোলাঙ্কি। বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পদ্মভূষণ ড. পদ্মা সুব্রহ্মণ্যম, পদ্মবিভূষণ শ্রীমতী সোনাল মান সিংহ, সংস্কার ভারতীর রাষ্ট্রীয় সংরক্ষক বাবা যোগেন্দ্রজী, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী বাসুদেব কামাত প্রমুখ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টার, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সুভাষ ঘাই ও রাজদত্ত।

মালদহের যদুপুরে সিংহবাহিনী ক্লাবের বস্ত্র বিতরণ

গত ৪ নভেম্বর মালদহ জেলার যদুপুর গাবগাছি সিংহবাহিনী ক্লাবের উদ্যোগে কালীপুজো উপলক্ষে দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। যদুপুর, কমলাবাড়ি, বড়ো সাঁকো ও নাগোরপাড়ার ৬৫ জন দুঃস্থ, বিধবা ও বয়স্ক মহিলা এবং পুরুষকে শাড়ি ও মোটা চাদর বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে ক্লাবের সদস্যরা নামসংকীর্তন, বাউল গান এবং গীতা পাঠের আয়োজন করেন। ক্লাবের সম্পাদক অর্ণব ঘোষ (বাপ্পা) বলেন, ছয় বছর ধরে তারা বস্ত্র বিতরণ করে আসছেন। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি নকড়ি প্রামাণিক, প্রধান অতিথি গণপতি ঘোষ, অসিত দাস (হারান)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তরুণ কুমার পণ্ডিত ও সুনন্দা ঘোষ।

নোটবাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত একদিন গর্ব করবে

অতিথি কলম

অরুণ জেটলি

ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসে ৮ নভেম্বর, ২০১৬ দিনটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কালোটাকার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমাদের সরকার ওইদিন যুদ্ধ শুরু করেছিল। আমরা, ভারতীয়রা এতদিন 'চলতা হ্যায়' গোছের মানসিকতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে বাধ্য হতাম। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন সমাজের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত গোষ্ঠীর মানুষজন। দেশের মাটি থেকে কালোটাকা এবং দুর্নীতির শেকড় উপড়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরেই সাধারণ মানুষ অনুভব করছিলেন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রেক্ষাপটে ছিল মানুষের এই ভাবনা। অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে নরেন্দ্র মোদীই ছিলেন তাদের একমাত্র পছন্দ। অন্য কেউ নন।

নরেন্দ্র মোদীও তাঁর কথা রেখেছেন। শপথ গ্রহণ করার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার কালোটাকার বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল) গঠন করে। সারাদেশ জানে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালতের পরামর্শ কীভাবে বছরের পর বছর অগ্রাহ্য করেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তে কংগ্রেসের অনীহার আর একটি প্রমাণ বেনামি সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন কার্যকরী করতে ২৮ বছরের বিলম্ব।

বর্তমান সরকার গত তিন বছরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং প্রচলিত আইনকে পরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে গড়িমসি করেনি। এইসব সিদ্ধান্তের মধ্যে যেমন সিট গঠন করা রয়েছে, ঠিক তেমনই রয়েছে বিদেশে কেনা সম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন, নোটবাতিল এবং জিএসটি।

সারা দেশে যখন প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অ্যান্টিব্ল্যাকমানি ডে পালিত হচ্ছে তখন সরকার-বিরোধী কেউ কেউ জানতে চাইছেন নোটবাতিল করে কী এমন লাভ হলো? এই নিবন্ধে নোটবাতিলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদি সুফলগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

আর বি আইয়ের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ৩০.৬.২০১৭ তারিখের মধ্যে ১৫.২৮ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের স্পেসিফায়েড ব্যাঙ্ক- নোট ব্যাঙ্কগুলিতে ফেরত এসেছে। ৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাজারে ১৫.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের নোট চালু ছিল। বাজারে সমস্ত মুদ্রাঙ্কের (১০, ৫০, ১০০, ৫০০, ১০০০ মিলিয়ে) নোট ছিল ১৭.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের।

নোটবাতিলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভারতের নগদনির্ভর অর্থনীতিকে কম নগদের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। এর জন্য কালোটাকার প্রবাহ বন্ধ করা দরকার। ভারতীয় বাজারের একেবারে তৃণমূল স্তরে নগদের ক্রমহ্রাসমান ব্যবহার প্রমাণ করে এই উদ্দেশ্যের কিছুটা হলেও পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। উদ্বৃত্ত নোটের জোগান কম বলেই ব্যবহার কম। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত যা রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে ভারতে কারেন্সি ইন সার্কুলেশন ১৫.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ বছরওয়াড়ি হ্রাসবৃদ্ধি (--) ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা। এই অঙ্কটা গত বছর এই সময় ছিল (+) ২.৫০ লক্ষ কোটি টাকা। এর থেকে প্রমাণিত হয় দেশে কারেন্সি ইন সার্কুলেশন কমেছে প্রায় ৩.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন আমরা দেশের অর্থনীতি থেকে অতিরিক্ত নগদ বের করে দিতে চাই? কেনই বা নগদ লেনদেন কমাতে চাই। একথা অনস্বীকার্য নগদ টাকার কোনও স্থায়ী ঠিকানা হয় না। নোটবাতিলের পর ১৫.২৮ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ফিরে আসায় বলা যেতে পারে দেশীয় অর্থনীতির সিংহভাগ নগদের ঠিকানা আমরা জানতে পেরেছি। সেইসঙ্গে জানতে পেরেছি বেশ কিছু অন্যায্য অর্থনৈতিক লেনদেনের কথাও, যার পরিমাণ ১.৬ লক্ষ কোটি থেকে ১.৭ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজস্ব আধিকারিক এবং তদন্ত এজেন্সিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দেওয়া।

এ কাজে অনেকটাই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নথিভুক্ত অবৈধ লেনদেনের সংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ছিল ৬১,৩৬১টি। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,৬১,২১৪। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে অবৈধ লেনদেনে সাহায্যকারী সংস্থা ছিল ৪০,৩৩৩, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৯৪,৮৩৬। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দালালের সংখ্যাও। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ছিল ৪,৫৭৯। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে হয়েছে ১৬,৯৫০।

প্রাপ্ত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর আয়কর বিভাগ চলতি অর্থবর্ষে যে পরিমাণ নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে তা ২০১৫- ১৬ অর্থবর্ষের তুলনায় দ্বিগুণ। এখনও পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর, ২০১৭) ১৫,৪৯৭ কোটি টাকার অঘোষিত (এবং হিসেব-বহির্ভূত) আয় সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে যা গতবারের থেকে ৩৮ শতাংশ বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে চিহ্নিত অঘোষিত আয় ১৩,৭১৬ কোটি টাকা যা গতবারের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি। বাজেয়াপ্ত এবং চিহ্নিত অঘোষিত আয়ের সর্বমোট পরিমাণ ২৯,৩১৩ কোটি টাকা।

ফঃ ৪

এটা দেশব্যাপী সন্দেহজনক লেনদেনের ১৮ শতাংশ। ৩১ জানুয়ারি ২০১৭, অপারেশন ক্লিন মানি উদ্যোগ ঘোষিত হবার পর কালোটাকা ধরার প্রক্রিয়ায় আরও গতি এসেছে। এছাড়া আরও কয়েকটা কথা বলা দরকার। ৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখের মধ্যে ৫৬ লক্ষ নতুন করদাতা আয়কর দপ্তরে তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। গতবার এই সংখ্যাটা ছিল ২২ লক্ষ। যাঁরা কর্পোরেট সংস্থায় চাকরি করেন না, তাঁদের সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স বেড়েছে ৩৪.২৫ শতাংশ। অবশ্যই গতবার এই সময়ের (১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ৫ আগস্ট ২০১৭) তুলনায়। করদাতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং হিসাব-বহির্ভূত নগদের মূলস্রোতে ফেরার ফলে বেড়েছে অগ্রিম কর প্রদানের পরিমাণও। অঙ্কের বিচারে যা ৪২ শতাংশ।

নোটবাতিলের ফলে ২.৯৭ লক্ষ ভুয়ো শেল কোম্পানি ধরা পড়েছে। পুরো বিষয়টা নজরে আসার পর প্রতিটি কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ নোটিশ পাঠানো হয় এবং রেজিস্টার অব কোম্পানিজের তালিকা থেকে অপসারিত করা হয়। কিন্তু এ তো হলো কয়েকটি ভুয়ো কোম্পানি বেআইনি ঘোষণা করার প্রক্রিয়া। এরপরেও কয়েকটি জরুরি কাজ থেকে যায়। কোম্পানিগুলি যাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কোনও আর্থিক লেনদেন করতে না পারে তার জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিজ করেছে সরকার। এমনকী এইসব কোম্পানির কোনও ডিরেক্টর বা অন্য কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারী কোনও সংস্থায় যোগদান করলে সেই নিয়োগ হবে বেআইনি এবং নিয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার। অবৈধ শেল কোম্পানিগুলির মধ্যে ২৮,০৮৮টি কোম্পানির ৪৯,৯১০টি অ্যাকাউন্টে ১০,২০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল নোটবাতিল ঘোষণার পর। এবং তা চলেছিল কোম্পানিগুলি বেআইনি ঘোষিত হবার দিন পর্যন্ত। এইসব কোম্পানির অনেকগুলিরই ১০০টির বেশি অ্যাকাউন্ট ছিল। একটি কোম্পানির কথা জানা গেছে যাদের অ্যাকাউন্ট ছিল ২, ১৩৪টি। আয়কর বিভাগ আলাদা করে ১১৫০টি শেল কোম্পানিকে চিহ্নিত করেছে, যাদের কাজ ছিল কালোটাকাকে সাদা করা। ২২,০০০ ক্লায়েন্টকে সুবিধে পাইয়ে দেবার জন্য মোট ১৩,৩০০ কোটি কালোটাকা সাদা করা হয়েছে।

নোটবাতিলের পর সেবি দেশের শেয়ার বাজারগুলিতে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে। যারা প্রকৃতপক্ষে অসৎ এবং রাতারাতি বড়লোক হবার মানসিকতা সম্পন্ন অনেক সময় তাদের আলাদিনের প্রদীপ হয়ে ওঠে নিষ্ক্রিয় ও সাসপেন্ড হওয়া সংস্থাগুলো। এই ধরনের সংস্থা যাতে দেশের কোনও এক্সচেঞ্জে না থাকে তার জন্য ৪৫০টি কোম্পানিকে সেবি তাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এবং তাদের পরিচালকদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। সেবির তালিকাভুক্ত কোনও কোম্পানির ডিরেক্টরও তারা হতে পারবেন না।

এরপরে আসব একটি চমকপ্রদ তথ্যে। নোটবাতিল ঘোষণা হবার পর বিমাসংস্থাগুলি দ্বিগুণ প্রিমিয়াম সংগ্রহ করেছে। নভেম্বর, ২০১৬ থেকে জানুয়ারি, ২০১৭— এই পর্বে সংগৃহীত প্রিমিয়াম গত বছর এই সময়ের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বেশি। সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত প্রিমিয়াম সংগ্রহে বৃদ্ধি হয়েছে ২১ শতাংশ। যা গতবারের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

আগেই বলেছি, নোটবাতিলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের নগদনির্ভর অর্থনীতিকে কমনগদের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। এই উদ্দেশ্য পূরণে চলতি অর্থবর্ষে আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি।

ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন হয়েছে ১১০ কোটি ক্ষেত্রে। যার মূল্য ৩.৩ লক্ষ কোটি টাকা। ডেবিট কার্ডে হয়েছে ২৪০ কোটি আর্থিক লেনদেন। যার মূল্যও ৩.৩ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ক্রেডিট কার্ডে কেনাবেচা হয়েছিল ২.৪ লক্ষ কোটি টাকার এবং ডেবিট কার্ডে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা। প্রি-পেইড ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ছিল ৪৮,৮০০ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে তা ৮৩,৮০০ কোটি টাকা। নোটবাতিলের পর ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে ফান্ড ট্রান্সফারের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। ১৬০ কোটি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারে ১২০ লক্ষ কোটি টাকার আদানপ্রদান হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে ১৩০ কোটি ট্রান্সফারে মাত্র ৮৩ লক্ষ কোটি টাকার আদানপ্রদান হয়েছিল।

নগদনির্ভরতা না কমালে কালোটাকা বা দুর্নীতিতে লাগাম পরানো সম্ভব নয়। ভারতের সাধারণ মানুষ এই কথাটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। যে কারণে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সংখ্যা বেড়েছে। এই সেদিনও যাদের ইপিএফ বা ইএসআইসি-র সুবিধা দেওয়া হতো না, নিয়োগকারী সংস্থাগুলো এখন সেই সুবিধা তাদের দিতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত নগদ থাকলেই আয়কর দপ্তর তার উৎস জানতে চাইবে। নোটবাতিলের পর এক কোটি সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিজীবী ইপিএফ এবং ইএসআইসি-র তালিকাভুক্ত হয়েছেন। ৫০ লক্ষ কর্মচারীর বেতন সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে।

নোটবাতিলের ফলে কাশ্মীরে বিক্ষোভ এবং পাথর ছোঁড়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। সেইসঙ্গে বলতে হবে মাওবাদীদের কথাও। নগদের মজুদে ধস নামার ফলে তারা আস্তে আস্তে বিষহীন ঢোঁড়া সাপে পরিণত হচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নোটবাতিলের একটি উদ্দেশ্য হলো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া জালনোটের কারবারে ইতি টানা। এই ব্যাপারেও সরকার সাফল্য দাবি করতে পারে। নোটবাতিলের পর যত সংখ্যক জালনোট ধরা পড়েছে তা আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

সব দিক বিবেচনা করে বলা যেতে পারে নোটবাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে ভারত এক স্বচ্ছ এবং সৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো এর সুফলগুলো দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু আগামী প্রজন্ম ৮ নভেম্বর, ২০১৬-র দিনটিকে নিয়ে গর্ব করবে। তাদের মনে পড়বে, অনেক বছর আগে এই দিনটি দেশের অর্থনীতিকে তার স্বচ্ছ-সুন্দর ভাবমূর্তি ফিরিয়ে দিয়েছিল। খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার পরিসর দিয়েছিল সারা দেশকে। ■

চিঠিপত্র

এ কোন বুদ্ধিজীবী সমাজ

পরান্নজীবী ও রাজ-উচ্ছিষ্টপ্রেমী বাংলার বুদ্ধিজীবীরা রাজকীয় তোষামোদের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন স্থানে ভূষিত হচ্ছে। এই গিরগিটিরূপী বুদ্ধিজীবীরা বাম আমলে একই চরিত্র বজায় রেখেছিল। সেই ট্র্যাডিশন আজও রয়েছে, শুধুমাত্র পরিস্থিতি অনুযায়ী চরিত্র ও চালচলন বদল করেছে। তাই বাংলায় প্রায়শ কোনো প্রথমশ্রেণীর সংবাদপত্রের উপসম্পাদকীয়তে বুদ্ধিজীবীদের লেখায় কোনো সদর্থক প্রতিবাদ করতে এখন আর দেখা যায় না। সত্যই আজ বাংলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি জগতের কর্ণধারদের কপাল পুড়েছে। তাই রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিয়ে মহারানির সুরে সুর মিলাতে বুদ্ধিজীবীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু এরা একদিনের জন্য হলেও ১৯৯০ সালে বাস্তুচ্যুত এক লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য, পূর্ববাংলায় প্রায় ২৯ শতাংশ হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে নির্বংশ হওয়া, গোধরাকাণ্ডে হিন্দু করসেবকদের পুড়িয়ে মারা, একতরফাভাবে শুধুমাত্র মৌলবিদের ভাতা দেওয়া, সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড, মরিচঝাঁপিতে হিন্দুদের সরকারি ভাবে নৃশংস আঘাত করা, বালিগঞ্জে প্রকাশ্য দিবালোকে ১৯ জন সন্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মারা, বাংলার সীমান্ত এলাকা হিন্দুশূন্য হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা গেল না, ঠিক তেমনিভাবে রাজ্য সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি বাজেট বরাদ্দ কেনই বা পিছিয়ে পড়া তফশিলিজাতিদের জন্য বরাদ্দের চেয়ে বেশি, তা নিয়ে রাজউচ্ছিষ্টভোজী বুদ্ধিজীবীরা নির্বাক থেকে গেল, তা দেশপ্রেমিকদের ভাবায়। বাংলায় আজও দেখা যায়, খিদিরপুর-সহ অনেক মুসলমান প্রধান এলাকা কীভাবে এবং কেনই বা মিনি পাকিস্তান হয়ে গড়ে উঠল, তার মূল্যায়ন কোনো রাজনীতিবিদ করেনি। আজ খাগড়াগড়, কালিয়াচক, ধুলাগড়, ক্যানিং, ইলামবাজার, চন্দননগর, নন্দীগ্রাম, পুরুলিয়াতে দেশ বিরোধী শক্তির রমরমা তা কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার এক ক্ষুদ্র বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই বহিঃপ্রকাশেই তসলিমা মেদিনীপুরে কবিতা পাঠের আসরে আসতে পারেনি শুধু নয়, তাকে বাংলাছাড়াও করেছিল স্থায়ীভাবে। এইসব ঘটনা হচ্ছে আর একটা ক্যালকাটা কিলিংয়ের এর পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র।

সম্প্রদায় ভিত্তিতে অখণ্ড বাংলা বিভাজিত হওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভেবেছিল, এই বাংলায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন শান্তিপূর্ণ ভাবে পাশাপাশি বসবাস করতে পারবে। সেই সহজ-সরল তত্ত্বে বোধহয় কোথাও ভেজাল ছিল। তাই কেবলমাত্র তিথিভিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে অপশক্তির চাপে বদলে দিয়ে, অনুষ্ঠানকে অশৌচ করতে সরকার পিছপা হচ্ছে না। বাংলার সমস্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এসব নিয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় মগ্ন আছে। বাংলার আকাশে রাজশক্তির বদান্যতায় দর্পিত ভাবে নয়া জিন্নাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাই আজ বাংলায় কোনো একা কুম্ভকেও পাওয়া যাচ্ছে না, যে শ্যামাপ্রসাদের এই খণ্ডিত বাংলাকে রক্ষা করবে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পুর্ব মেদিনীপুর।

মুকুল রায়ের বিজেপিতে যোগদান করাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত

মুকুল রায় বিজেপি দলে যোগদান করায় রাজ্য রাজনীতিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছে ভাল কাজ আবার অনেকে বিজেপি দলটাকে গালিগালাজ বা সমালোচনা করছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন ও অন্নের অভাবে বামপন্থীরা শহরাঞ্চল বা শিল্পাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর যুক্তফ্রন্টের আমলে মানুষ বামপন্থীদের দিকে ঢলে পড়েছিল। আবার ইন্দিরা গান্ধীর চমক দেওয়া নীতি ও বাংলাদেশের উত্থানের ফলে বেশির ভাগ বাংলার লোক ইন্দিরার দলে চলে এসেছিল। যার ফলে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নব কংগ্রেসি রাজত্ব। আবার জরুরি অবস্থার পর জনগণ বামপন্থী বিশেষ করে সিপিএমকে সমর্থন করেছিল। আবার ২০০৯ সাল থেকে লোকে আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই শতাব্দীর গোড়া থেকে লোকে বিজেপি ও তৃণমূল, তারপর তৃণমূলে বেশিরভাগ জনসাধারণ চলে এসেছিল। হয়তো ভবিষ্যতে এই জনগণ বিজেপিতে চলে যাবে। এটাই নিয়ম। স্বভাবতই নেতারাও নীতি ও দল পরিবর্তন করবে। সেই হিসেবে মুকুল রায়ের বিজেপিতে আসাটা কোনো ব্যতিক্রম নয়।

তবে মুকুল রায়ের জন্য বেশি আলোচনা হচ্ছে এই কারণে যে এই ব্যক্তি তৃণমূল জন্মের আগে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন। এরকম বহু নেতা-নেত্রী জার্সি বদল করেছে। নির্বেদ রায়, সুব্রত মুখার্জী, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য। এখন মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তিনি নাকি সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত এবং সিদ্ধার্থ সিংহ 'মুকুল ভাগ' বলেছিলেন। সারদা-নারদাতে বহু নেতা-নেত্রী অভিযুক্ত। তাঁরা ইডি, সিবিআই অফিসে জেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এমনকী সিপিএমের রবীন দেবও সিবিআই অফিসে হাজিরা দিয়েছিল। মুকুল রায়ও নোটিশ পাঠানোর পরই হাজিরা দিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে সেরকম কোনো অভিযোগ সিবিআই বা ইডি আনতে পারেনি। সুতরাং তাকে ব্ল্যাক লিস্টেড বলা যায় না। এ ব্যাপারে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে। যদিও তিনি সময় পাননি এবং লোকে বলে তিনি নাটের গুরু তিনিও কিন্তু দোষী প্রমাণিত হননি। সুতরাং এই কারণে মুকুল রায়কে দোষ দিলে অন্যায় করা হবে।

—কমল কুমার মুখোপাধ্যায়,
সেগুনবাগান, ধরমপুর, চুঁচুড়া।

মোগলসরাইয়ের নতুন নামকরণ

খবরে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি মোগলসরাই রেল স্টেশন-সহ সংলগ্ন এলাকার নাম পরিবর্তন করে 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর' করেছে। দেশভক্ত ওই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে জানাই সাধুবাদ। দেরিতে হলেও সরকারের এই সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ সঠিক, সময়োচিত এবং প্রশংসনীয়। কারণ এর ফলে এলাকাটি কালিমা মুক্ত হলো।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ভারত প্রায় হাজার বছর বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা শাসিত, শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। বহু মঠ, মন্দির ও বিগ্রহ হয়েছে অপবিত্র বা ধূলিসাৎ। অষ্টম শতাব্দী (৭১২ খ্রিস্টাব্দ)-তে আরবের মহম্মদ-বিন-কাশিম সিন্ধুদেশে অভিযান চালিয়ে রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতে আরব শাসন প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর ভারত অভিযান করে তুর্কি ও মোগলরা। দুর্ধর্ষ তৈমুরলঙ্গ ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে এবং চিঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের বংশধরেরা প্রায় দু'শ বছর রাজত্বে করে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে ছিল মুসলমান শাসন। এছাড়াও পরবর্তী প্রায় দু'শ বছর ভারত শাসন করে ইংরেজরা।

এই বহিরাগত মুসলমান ও ইংরেজদের দীর্ঘকালীন শাসনে ভারত তথা হিন্দুস্তানের হিন্দুরা যেমন হারিয়েছে তাদের স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও স্বাভিমান, তেমনি ভুলে গেছে ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পরম্পরা, ধর্মীয় অনুশান ও ইতিহাসকে বহুলাংশে। ফলে হীনমন্যতায় ভোগা হিন্দুরা বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার হয়েছে শিকার। আর তারই সুযোগ নিয়েছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। তারা এদেশের অধিকাংশ মঠ, মন্দির ও স্মৃতিসৌধকে ধূলিসাৎ করে তার উপরে নির্মাণ করেছে স্বস্ব নামাঙ্কিত বা স্বধর্মীয় উপাসালয়, স্মারক-সৌধ। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান ও রাস্তার নামকরণও হয়েছে পুরানো নাম পাল্টে। যেমন— কুতুব মিনার, বাবরি মসজিদ, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি, জ্ঞানবাপী মসজিদ, এলাহাবাদ, হায়দরাবাদ, আওরঙ্গাবাদ, বক্তিয়ারপুর, শেরপুর, তুঘলকাবাদ, আহম্মদাবাদ, শেরশাহ সুরি রোড, তুঘলক রোড, আকবর রোড প্রভৃতি। ইংরেজরাও বহুস্থান ও রাস্তার নামকরণ করেছে নিজেদের নামে। এটা সাম্রাজ্যবাদীদের ধর্ম। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরানো ইতিহাস পাল্টে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি ও আধিপত্যকে সুদৃঢ় করা। আর মোগলসরাই নামটিও মোগলদেরই দেওয়া, যে নামটি কিছুদিন আগেও ছিল।

স্বাধীন ভারতকে প্রায় ৭ দশক শাসন করেছে 'সেকুলারবাদী' কংগ্রেস ও তার তাঁবেদাররা। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে বা করছে হিন্দু বিদ্বেষী, দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টরা। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের দেওয়া কিছু স্থানও রাস্তার নামের পরিবর্তন ঘটালেও মুসলমান ভোট হারাবার ভয়ে মুসলমান শাসকদের দেওয়া নাম পরিবর্তনে সাহসী হয়নি। এটা দেশের লজ্জা, কলঙ্ক। সত্যি বলতে, ভারত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও এতদিন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পায়নি। কমিউনিস্ট- সেকুলারিস্টরা গেল গেল রব তুললেও যোগী-সরকার পণ্ডিত দীনদয়ালের নামে মোগলসরাইয়ের নামকরণ করে জাতির কলঙ্ক মোচনের কাজটা শুরু করলেন। উল্লেখ্য, এখানেই খুন হয়েছেন ভারতমাতার সুসন্তান দীনদয়াল উপাধ্যায়। তাই পুনর্নামকরণ যথার্থ।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

মেমারী মুখ্য ডাকঘরের অচলাবস্থা

মেমারী মুখ্য ডাকঘরের আমানতকারীদের অবস্থা এতই খারাপ যে সাধারণ ও প্রবীণ নাগরিকগণের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা শুনতে পাওয়া যায়, 'এবার ম্যাচিওর করলে আর পোস্ট অফিসে নয়; এবার ব্যাঙ্কে টাকা রাখব'। মেমারী পোস্টঅফিসে প্রবীণ নাগরিকদের একমাত্র সুবিধা একতলা এবং সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। বাদবাকি যেমন জেনারেটর থাকতেও চলে না, লিঙ্ক ফেলিওর বোর্ডটি টাঙাতে পারলে ডাককর্মীগণ খুশি হন। ডাক কর্মচারীর সংখ্যা এতই কম যে স্ট্যাম্প, পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদির কাউন্টার খোলা থাকে কিন্তু কেউ থাকেন না। একনম্বর কাউন্টারের চেয়ারে যিনি থাকেন তাঁর নিজের কাজ সেরে দয়া হলে, তবে খাম পোস্টকার্ড পাওয়া যায়। পাশবই আপডেটের কথা বললেই, হয় মেসিন খারাপ না হয় ফিতে পাল্টাতে গেছে ইত্যাদি শুনতে হয়। প্রিন্টারের ফিতে প্রায় খারাপ হয় আর সেই প্রিন্টারের ফিতে পাল্টাতে বর্ধমান যেতে হয়। ঠিক হয়ে আসে মোটামুটি এক সপ্তাহ পরে। অথচ বর্ধমানের এসএসপিও মুখ্যডাক অধিকর্তাকে জানিয়ে দিলেন মেমারীতে মুখ্য ডাকঘরের সব কাজ সুচারুরূপে চলছে। সুচারুরূপে চালানোর জন্য প্রথম প্রয়োজন (১) জেনারেটরটি ঠিক করা, (২) আরও কর্মী নিয়োগ, (৩) প্রিন্টারের বিকল্প ব্যবস্থা, (৪) অতিরিক্ত টাওয়ারের ব্যবস্থা করা। ডাকঘর খোলার সময় বোর্ডে লেখা আছে ৯টা থেকে বেলা ২টা অবধি অথচ বেলা ১২-৩০ থেকে বেলা ১-১০ মিনিট সব কাউন্টারের চেয়ার কর্মী শূন্য অবস্থায় মুখব্যাদান করে থাকে। এই অব্যবস্থার সত্তর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।

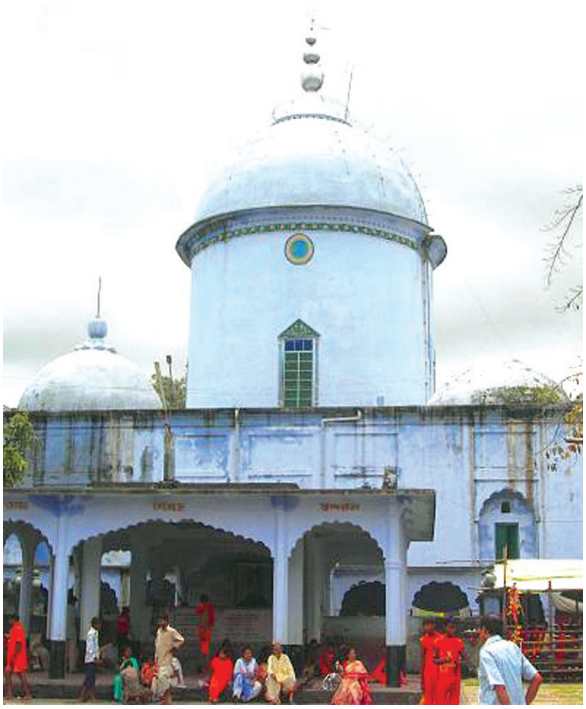

জাগ্রত জল্পেশ

আশীষ ভট্টাচার্য

উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় শৈবক্ষেত্র হলো উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ মন্দির। প্রকৃতি পূজক হিন্দুরা ঈশ্বর উপলব্ধি করার জন্যে ইট, কাঠ, পাথরকেও ঈশ্বরের আসনে বসাতে কোনোদিন কুণ্ঠিত হয়নি। হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে ভগবান দৈব গুণসম্পন্ন এক কাছের মানুষ। আর ভগবান শিব সেই জন্যই আসেতু হিমাচল হিন্দুদের এত আপন, যে সংসারী হয়েও যোগী, আবার যে ভিখারি হয়েও সর্ববিদ্যা, সর্বশাস্ত্র, সর্বগুণের অধীশ্বর। কখনো তিনি পশুর পতি, কখনো বা নটরাজ, কখনো তিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠ বৈদ্যনাথ আবার কখনো আদি যোগী। তাই তো নির্গুণ, নিরাকার, অনির্বচনীয় ব্রহ্মে বিশ্বাসী অদ্বৈতবাদী শঙ্কারাচার্যও নির্বাণ শতকমে আত্মাকে 'চিদানন্দ রূপম শিবোহম্ শিবোহম্' অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ শিবের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রবেশ দ্বারে দুটি দাঁতাল হাতির শুড়ের মাথার অষ্টবিংশতিদল পদ্ম আসনের ওপর নন্দী পৃষ্ঠে বসে আছেন ত্রিশূলধারী স্বয়ং মহাদেব। ঠিক তার দু'পাশে দুই থামের মাথায় বসে আছেন মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহ। মূল দ্বার পেরিয়ে লোহার ফটক অতিক্রম করে, ১২৭ ফুট উচ্চতা ও ১২৪ ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থ যুক্ত এই ভূভারতের উচ্চতম মধ্যযুগীয় শৈলীতে নির্মিত ধবল শিবতীর্থে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের সামান্য পূর্বে বাঁদিকে মহাকাল মহাদেবের মন্দির অবস্থিত এবং মূল মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে অক্ষয় বটবৃক্ষ, যার ডালে মানসিক করে মন্ত্রপূত লাল সুতোর তাগা বেঁধে দেওয়া হয়। মূল মন্দির তিন তলার, যার মধ্যে প্রথম তল ভূগর্ভস্থ, দ্বিতীয় তলের ছাদের চার কোণ চারটি অর্ধগোলক যুক্ত এবং তৃতীয় তল অর্থাৎ মূল গর্ভগৃহের ছাদ সুউচ্চ বিরাট অর্ধগোলক যার মাথায় ক্রমান্বয়ে তিনটি কলস ও তার ওপর ত্রিশূল প্রতিস্থাপিত।

স্কন্দ পুরাণে এই মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধিত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মহাভারত কালের ভগদত্তের শেষ বংশধর রাজা জল্পেশ বর্মন তাঁর পাঁচ পুত্রের মৃত্যুশোক কাটানোর উদ্দেশে বশিষ্ঠ মুনির শরণাপন্ন হলে, তিনি রাজা জল্পকে মহাকাল বনে গিয়ে এক স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের উপাসনা করতে বলেন। পরবর্তীতে জল্প রাজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের নাম হয় জল্পেশ মন্দির।

সুলতানি যুগে বখতিয়ার খিলজি নালন্দা ধ্বংস করে কামরূপের পথে অগ্রসর হওয়ার পথে এই মন্দিরকেও ধ্বংস করে। কিন্তু অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েও নিজ সমাজের পুরুষার্থ বলে পূর্বাপেক্ষা অধিক মহিমায় খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকে ভুটান রাজার দ্বারা ভগ্নস্তূপ থেকে এই মন্দির পুনরায় উঠে দাঁড়ায়। কালের নিয়মে এই স্থান আবার জঙ্গলাবৃত হয়ে উঠলে ১৫২৪ সালে কোচবিহার রাজার পিতা বিশু সিংহ দ্বারা পুনরায় এই মন্দিরের সংস্কার শুরু হয়। এর পর তাঁর পুত্র নারায়ণ সিংহ ১৫৬৩-তে মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এর শত বছর পর প্রাণনারায়ণ সিংহের পূর্ববর্তী বংশধর মন্দিরের সংস্কার করেন।

মূল মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে মন্দির উন্নয়ন তহবিলে ১০ টাকা দান করে, নন্দী মহারাজকে সাক্ষী রেখে, গান্ধী মুনি ও মান্য মুনি এই দুই দ্বারপালের অনুমতি নিয়ে ভূমিতল থেকে চোদ্দ ধাপ অর্থাৎ নয় ফুট নীচে নেমে বাবা জল্পেশের সাক্ষাৎ হয়। যদিও তিনি অনাদি ও স্বয়ম্ভু, তথাপি তিনি দেড় ফুট ব্যাস যুক্ত ও প্রায় তিন ফুট গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করেন। আড়ম্বরহীন বর্গাকার এই গর্ভগৃহের ১২৭ ফুট গোলকের ওপর থেকে একটা ধাতব শলাকা চাঁদোয়া ভেদ করে শিবলিঙ্গের কিছু ওপর পর্যন্ত ঝুলছে, ঠিক যেমনটা আজও আগ্রার তাজমহলের সমাধি গৃহে ঝুলছে। পূর্বে হয়তো এখানে একটি কলস ঝুলত যার ওপর থেকে অবিরত বারিধারা ভোলে বাবাকে জলাভিষেক করে রাখত। যদিও বর্তমানে এ স্থলে সিএফএল ল্যাম্প ঝুলছে। যে গহ্বরে শিবলিঙ্গ অবস্থিত তা বছরের অনেক সময়তেই প্রাকৃতিক জলধারার জলে পূর্ণ থাকে, বিশেষত বর্ষার সময়।

এই মন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো মন্দিরের পূজারি সমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বা সদানন্দ বাবার পূজা পদ্ধতি। সৌভাগ্যবশত বাবা জল্পেশের রুদ্রাভিষেকের সময় উপস্থিত থাকলে তাঁর এই কৌশল দেখার সৌভাগ্য হয়। দীর্ঘ দু' ঘণ্টা ধরে অবিরত সংস্কৃত মন্ত্রচারণ এক স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি করে। কখনো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোনো রাগে কখনো বা অতি পরিচিত বাংলার বাউলের ছন্দে তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত শিবমহিমা স্তোত্রম্, শিবতাণ্ডব স্তোত্রম্, শিবাষ্টক স্তোত্রম্ বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র শুনতে শুনতে মনে হবে যেন কৈলাশ পুরীতে বসে শিবের দর্শন লাভ হচ্ছে। ■

কড়ি গাঁথা নক্‌শা

চূড়ামণি হাটি

কড়ি সমৃদ্ধির প্রতীক। প্রবাদে আছে 'ফেল কড়ি মাখো তেল'। অপদেবতার দৃষ্টি এড়াতে লৌকিক বিশ্বাসে মড়া ঘরের ছুঁড়ে দেওয়া কড়ি-পয়সা কোমরের ঘুনসিতে বেঁধে রাখা হয়। বিষ্টু পাল কথিত মনসার গানে কড়ি গাঁথা মনসাঘটের উল্লেখ আছে। কড়ির নকশা বুনন বা কড়িগাঁথা শিল্প এক সময় বাঙালির ঘরে ঘরে গুরুত্ব পেয়েছিল। শিল্পীরা বাঙালি গৃহবধূ। এক সময় 'কড়ি গাঁথবে গো' বলে হাঁক তুলতো অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর শ্রমজীবী বধূরা।

লক্ষ্মীর ঘটে কিংবা ধানের মড়াইয়ের গায়ে লাগানো গোবরের তালে কড়ি এঁটে দেওয়ার রীতি আজও আছে। গোরুর গলার সাজে কড়ি ও ঘুঙুরের মালা আজও ঠুঙ্ ঠুঙ্ করে বাজে; রাখালের বাঁশি বাজুক কিংবা না-বাজুক। কাপড়ের গোল ঝালর আর কড়ির সাজে হাতপাখা বেশ আভিজাত্য বহন করতো। মেয়েরা মাথায় পরতো ময়ূরের পেখম আকৃতির কড়ি বাঁধানো কৃষ্ণচূড়া কিংবা কড়ি গাঁথা মাথার জালি। পাটের বা সুতোর বাঁধুনি নকশা তোলা শিকেয় গেঁথে দেওয়া হতো কড়ি। কড়ি বাঁধানো পানের কৌটো কিংবা হুঁকো ছিল বেশ শখের। কাঠের পালঙ্কও কড়ির অলঙ্করণে সাজতো। কড়ি বাঁধানো আয়না ছিল বেশ প্রিয়।

কিন্তু সৌন্দর্য চেতনা অপেক্ষা কড়ির বৈষয়িক ও মাঙ্গলিক উদ্দেশ্যই এ শিল্পকলাকে প্রথম দিকে বেশি প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্মীর ঝাঁপি এবং সিঁদুরের চুপড়ি। বাঁশ-বেতের চুপড়ির গায়ে জড়ানো লাল শালুর উপর কড়ির অলঙ্করণ। কড়ি গাঁথা ঠাকুরের ঘটতো রয়েইছে। এ শিল্প ভাবনাটি রঙিনও হতে চেয়েছিল। কড়ির পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছিল রঙিন ন্যাকড়া, ময়ূরের পালক, অভ্রের টুকরো, আয়নার কাঁচ, সুতো, তার, বাঁশ, বেত। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়ায় এবং সাঁওতাল সমাজে বেশ চল ছিল।

'গাঁটের কড়ি খরচ করি'; একথায় 'কড়ির' বদলে 'পয়সা' শব্দটি এসেছে। বাজারে এসেছে নকল কড়ি। ঝোলা ব্যাগে সুতোর নক্‌শার সঙ্গে কড়ি গাঁথার বেশ চল রয়েছে। বর্তমানে মহিলা মহলে ভিন্ন রূপ নিয়ে কড়ির আকর্ষণ বেড়েছে। শুধু হারিয়েছে পুরনো ভাবনাগুলি। আসলে কড়ির নিজস্ব রূপই আকর্ষণের কারণ। ঐতিহ্যগত রসবোধকে কাজে লাগিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হস্তশিল্পীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সে ভাবে এখনও সফল হতে পারেননি। ■

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।

সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন

বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

যমরাজের হিসাব লেখক চিত্রগুপ্ত

দেবপ্রসাদ মজুমদার

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামে পরিচিত। ওই দিন বোনেরা ভায়েদের দীর্ঘজীবন কামনা করে যম ও যমুনাকে স্মরণ করে ভায়েদের কপালে ফোঁটা দিয়ে থাকেন। বাংলা তথা ভারতের সর্বত্রই এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যদিও এটাকে অনেকে অর্বাচীন ও লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান বলে থাকেন, তথাপি বলা যায় যমের ভগ্নী যমী ভাই যমকে ফোঁটা দিয়ে অমর করেছিলেন। ওই প্রথা বহু প্রাচীন। এই দিন যম ও যমুনার বা যম ভগ্নী যমীর পূজা করা হয়ে থাকে। এই তিথিতে আরও একজনের পূজা করা হয় তিনি হলেন চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে সাধারণে ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, আর কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ায় চিত্রগুপ্তের পূজা প্রচলিত থাকলেও তা ব্যাপক নয়। যমরাজের মন্ত্রী, সচিব বা কর্মচারী হিসেবে চিত্রগুপ্ত পরিচিত।

শাস্ত্রে ও পুরাণে চিত্রগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন, তখন তাঁর সেই ধ্যান নিরত অঙ্গ থেকে নানা বর্ণে চিত্রিত এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটল। সেই পুরুষের দুই হাত। তিনি এক হাতে মস্যাধার ও অপর হাতে লেখনী ধারণ করে আছেন। জন্মের পর তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে কী কাজ করতে হবে? ব্রহ্মা তখন যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে পুত্রকে আদেশ করলেন, তুমি যমলোকে যাও, সেখানে ধর্মরাজ যমের সঙ্গে বাস করে মানুষের পাপ পুণ্য বিচার করবার ব্যবস্থা করো ও যমলোকেই বাস কর। বললেন— আমার কায়া থেকে জন্ম হয়েছে বলে তুমি কায়স্থ নামে অভিহিত হবে। যমালয়ে যমের মন্ত্রী বা সচিব হিসেবে মানুষের পাপ পুণ্যের চিত্র বিচিত্র হিসেব গোপন রাখেন বলে ইনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত। জন্মানোর পর চিত্রগুপ্ত মানুষের কপালে ভাবী শুভাশুভ ফলাফলও লিখে থাকেন। এটাই ভাগ্যফল বা কপাল লিখন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাপীদের নরক যন্ত্রণা দান করবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পুরাণের কাহিনি অনুযায়ী চিত্রগুপ্তের অম্বষ্ঠ, মাথুর, গৌড়, সেনক, শ্রীবাস্তব্য প্রভৃতি ন'টি পুত্রের কথা জানা যায়।

পুরাণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণের কাহিনি থেকে জানা যায় ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সৌদাস চিত্রগুপ্তের পূজা করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। এই তিথিতেই মহামতি ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের উপাসনা করে তাঁর প্রসাদে ইচ্ছামৃত্যু বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন জাগে, ভারতবর্ষে কোথায় চিত্রগুপ্তের মন্দির আছে এবং কোথায় তিনি নিত্য সেবিত হন? এই প্রসঙ্গে বলা যায় দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুরমের এক দুর্লভ বিগ্রহ হচ্ছে চিত্রগুপ্ত স্বামীর মূর্তি। এর মন্দির বিষ্ণুকাঞ্চীতে অবস্থিত। ''চিত্রগুপ্ত হচ্ছেন যমরাজের হিসাব লেখক, সমস্ত প্রাণী ও দেবদেবীগণের ভালমন্দ সব কাজই তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। কোনো প্রাণীর মৃত্যুর পরে যমরাজের কাছে গেলে যমের নির্দেশে চিত্রগুপ্ত সেই প্রাণীর গত জন্মের পাপপুণ্য ও ভালমন্দ কাজগুলি বর্ণনা করেন। যমরাজ সেইমতো তার সুখ দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করেন। মন্দিরে চিত্রগুপ্তের যে উপবিষ্ট অর্চামূর্তি আছে তাতে দেখা যায় তিনি বাম হাতে তালপাতার এক পুঁথি ধরে আছেন, আর ডান হাতে লোহার কলম ধরে পুঁথিতে কিছু লেখার উদ্যোগ করছেন। করনম্বিকে তাঁর পত্নী, পাশেই বিরাজমান। চৈত্রমাসে চিত্রা পূর্ণিমায় চিত্রগুপ্ত স্বামীর বার্ষিক উৎসব হয়।' এই তথ্য দিয়েছেন শ্রী নৃসিংহ রামানুজদাস স্বামী তাঁর দেউলভূমি দক্ষিণাপথে পুস্তকে। মৃত্যুলোকের দেবতা যমের সঙ্গে কোথাও কোথাও চিত্রগুপ্তের পূজা হয়ে থাকে। ■

বয়ঃসন্ধির সময় সন্তানকে সামলানোর দায়িত্ব মায়ের

অঙ্গনা

বিদিশা আদিত্য

সবসময় খবরদারি করা কারই বা ভাল লাগে? বয়েসটা যদি হয় পনেরো-কুড়ির কোঠায়। যে সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে 'একা একা' সিনেমা দেখতে যাওয়াতেই আনন্দ। বিশেষ বিশেষ দিন দেরিতে বাড়ি ফেরা আলাদা রোমাঞ্চ। কিন্তু আপনার অভিভাবকের মন স্বস্তি পায় না। তার মানে সব সময় এই নয় যে আপনি কনজারভেটিভ। 'বন্ধুদের সঙ্গে বেরলে কিংবা উৎসব-পার্বণ-পার্টিতে গেলেই গোল্লায় গেল' মানসিকতায় ভোগেন।

আপনার চিন্তার কারণ অন্যত্র যদি কিছু ভুল করে, যদি কোনও বিপদ হয় আর এই উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটে বকুনি, মারধোর কিংবা বেরোতে না দেওয়ায়। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছেন কি ওদেরও একটা নিজস্ব জগৎ আছে। ভাবনাচিন্তা আছে, স্বপ্ন আছে। এই বয়সটাতে প্রিভেসিতে নাক গলানো তাদের একেবারেই পছন্দ না। তাই অভিভাবকদের উচিত নিজেদের পারিবারিক প্রেক্ষাপট, সন্তানের মানসিকতা এবং লাইফ স্টাইল অনুযায়ী এমন একটা গোল্ডেন মিন খুঁজে নেওয়া যাতে যথাযথ ব্যালান্স তৈরি হয়।

প্রাথমিক প্রস্তুতি :

(১) ছোট থেকে নিজের পরিবারের মূল্যবোধে বিশ্বাস গড়ে তুলুন। (২) ছোট থেকে ভুল স্বীকার করতে শেখান। মিথ্যে বলার প্রবণতা হবে না। (৩) এই বয়েসে আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর থাকে। অন্যের সামনে বকাবকি করবেন না। (৪) ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া, বাড়ি ফেরা সবেতেই একটা ডিসিপ্লিন তৈরি করুন। নিজেদের আচরণেও সেটা বজায় রাখুন। (৫) স্পেস দিন। (৬) সিদ্ধান্ত নিতে শেখান। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু আপনার মত চাপিয়ে দেবেন না। (৭) নিজে ইনসিকিওরিটিতে ভুগবেন না।

সাজগোজ :

(১) জিনস, ছোট টপ পরা যদি ট্রেন্ড হয় তবে তাই নিয়ে গোলমাল করবেন না। (২) নিজেকে নিরন্তর আপডেট করুন। (৩) খেয়াল রাখবেন পোশাকটি যেন আপনার মেয়েকে মানায় এবং শালীনতা বজায় থাকে। (৪) সিনেমা, ফ্যাশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করুন। যাতে সুস্থ রুচি গড়ে ওঠে। (৫) পোশাক নিয়ে মেয়ের সঙ্গে মতান্তর হলেও সরাসরি তর্কে যাবেন না। কয়েকটা অপশনস সামনে রাখুন। 'অন্য কোনও রঙ ভাল মানাবে' বা 'ঝুলটা একটু লম্বা নে, রোগা দেখাবে' বলে দেখতে পারেন। (৬) পার্টির আগে চুলে রঙ করতে চাইলে ওর সঙ্গে আলোচনা করুন, কোথায় করাবেন, কোন কোম্পানির প্রোডাক্ট ব্যবহার করবেন। আর যদি আপত্তি থাকে তাহলে বিদ্রোহ না করে বুঝিয়ে বলুন।

বন্ধুবান্ধব :

(১) ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করুন, কোথায় থাকে, বাড়িতে কে কে আছে জেনে নিন। (২) পার্টি বা নেমন্তন্নে কাদের সঙ্গে যাচ্ছে তার খবর রাখুন। (৩) কারও মোবাইল থাকলে ফোন নম্বর নিজের কাছে রাখুন। (৪) বাড়ি ফেরার সময় নির্দিষ্ট করে দিন। (৫) কারও বাড়িতে গেলে তাদের ফোন নম্বর, ঠিকানা জেনে নিন। (৬) এই বয়েসে মা-বাবা ছাড়া অন্য একটা জগৎ গড়ে ওঠে। বন্ধুবান্ধব ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। মা-বাবা ঢিলে দিলে এই সময়ে ছেলেমেয়েরা আরও দূরে সরে যায়। সতর্ক থাকুন। (৭) ছেলের গার্লফ্রেন্ড বা মেয়ের বয়ফ্রেন্ড শুনেই ভিরমি খাবেন না। (৮) অনেকক্ষণের জন্য বেরোলে মাঝে ফোন করতে বলুন।

খাওয়া দাওয়া :

(১) বাড়িতে না খেলে আগে থেকে জানিয়ে দিতে বলুন। (২) বাইরে খেলে কোয়ালিটি খেয়াল রাখতে বলুন। (৩) বাইরে জল না খাওয়া ছোট থেকে অভ্যেস করান।

পড়াশোনা :

(১) পড়াশোনা হচ্ছে না বলে টেনশনে ভুগবেন না। (২) তবে 'পড়', 'পড়' করে মাথা খারাপ করে ফেলবেন না। (৩) পার্টি, নেমন্তন্ন যাই থাক না কেন, সকালে পড়ার অভ্যেস বজায় রাখতে বলুন। (৪) আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এলে পড়ার চাপ, একদম পড়াশোনা করে না, একনাগাড়ে এইসব আলোচনা করবেন না। (৫) বাড়িতে বিয়ে বা কোনও অনুষ্ঠান থাকলে, পরপর কয়েকদিন পড়াশোনার অসুবিধে হলে আগে থেকে কিছু পড়া তৈরি রাখতে বলুন।

নিরাপত্তা :

(১) যে এলাকায় যাচ্ছে সেখানকার হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকুন। (২) বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাড়িতে গেলে চেষ্টা করুন ড্রাইভার সঙ্গে নিতে। (৩) বেশি রাত অবধি বাইরে থাকতে দেবেন না। ■

আজি কমলমুকুল দল খুলিল

বাংলার কমলবনে মুকুল রায়ের আগমন কোন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে তা এখনও সুপরিস্ফুট নয়। রাজনৈতিক মহলে এখনও সেটি মৃদু তরঙ্গের আভাস মাত্র, কিন্তু ঘটনার টানে সেটি চোরা ঘূর্ণির মতো কাজ করবে কিনা সেটাই লক্ষণীয়। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য মুকুলের বিদায়কে ফালতু ব্যাপার বলে কোনওরকম গুরুত্ব দিতে নারাজ। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কংগ্রেস থেকে চলে আসার পর মুকুলের নামেই তৃণমূল কংগ্রেসের নথিভুক্তি এবং তারপর থেকে তিনিই ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী এবং সম্পদে বিপদে তাঁর Factotum রূপে কাজ করেছেন। মমতার ছাত্রছায়ায় থাকলেও এতদিন যে তিনি তৃণমূলের শীর্ষস্তরে অবস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তার মূলে নিশ্চয়ই ছিল তাঁর অপরিহার্যতা। ক্ষমতার বৃত্তে সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলেই বোধ হয় আজ নতুন করে ঘুঁটি চালার পালা।

বাংলার নাটমঞ্চে দল বদলের পালা কিন্তু নতুন নয়। আসলে রাজনীতিতে যখন অস্তিত্বের সংকট দেখা যায়, তখন দল বদল না করে উপায় থাকে না। মুকুলের একদা নেত্রী স্বয়ং মমতাই একদিন কংগ্রেস ছেড়ে মুকুলের হাত ধরে তৃণমূল স্তরের রাজনীতি করে সবুজ জোড়া ফুলের তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। সেদিন কিন্তু কেবল তৃণমূল নামে দল গঠন করতে সাহস করেননি, তাই পরিচয়ে কংগ্রেসকে রেখে দিয়েছিলেন। যে কংগ্রেস রাজনীতিতে তাঁর জন্ম, যে কংগ্রেস তাঁকে সাংসদ করে পরিচিতি দিয়েছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর তিনি সেই কংগ্রেস-জন্মে আত্মধিক্কার প্রকাশ করেছেন। এটা আশ্চর্যের নয়, ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে।

মমতা কংগ্রেস ছাড়ার পর সেই প্রথম বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যথার্থ বিরোধী দল গড়ে ওঠে। এবং বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা মমতার দলে যোগ দেওয়ার ফলে দশ বছরের মধ্যেই সাফল্য; অতি বুদ্ধিমান বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্পপ্রাণ বুদ্ধুমির বুক চিরে। বিরোধীহীন বামফ্রন্টের লাল সন্ত্রাস এবং শ্বেত সন্ত্রাসে পর্যুদস্ত নিরুপায় মানুষ, তখন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেল, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে অকারণ বীভৎসার গোঁয়ার্তুমিতে। এবং সেই গণবিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে বাধ্য করল সমস্ত বিরোধী দলকে এককাট্টা হতে। এমনকী দিল্লিদূত যে প্রণব মুখার্জী প্রতি নির্বাচনে বিরোধী ভোট ভাগ করে বামফ্রন্টকে ওয়াকওভার দিতেন, তাঁর কংগ্রেসকেও বাধ্য হতে হলো এক হয়ে নির্বাচন লড়তে।

সাতষট্টি সালে বিরোধী ঐক্যে ফাটল সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেস তিরিশের অধিক আসন ছিনিয়ে নেওয়ায় শাসক কংগ্রেস গরিষ্ঠতা হারায়। সম্প্রতি এক 'বিশ্বজিৎ সাংবাদিক' বলেছেন, ছেষট্টি সালে প্রণব মুখার্জী নাকি অজয়বাবুকে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরামর্শ দেন। আরে তখন যুক্তফ্রন্ট কোথায় বাপ? বিরোধীরা তো সিপিএম ও সিপিআই নেতৃত্বে দুটি ব্লকে বিভক্ত। অতুল্য ঘোষ সরকার গঠন করবেন না বলে ঘোষণা দেওয়ার পর অনেক টালবাহানা করে অবশেষে অজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। মিথ্যার বেসাতি করা, সুবিধাবাদী বাংলা সাংবাদিকতার এক ধর্ম হয়ে উঠেছে।

অজয় মুখার্জীর কংগ্রেস ত্যাগ ও বামবিরোধীদের ঐক্য পশ্চিমবঙ্গে সাতষট্টি সালে সরকারের পরিবর্তন আনে। সেই একই ধারায় দেখা যায় সাতাত্তর সালে ইন্দিরা সরকারের পরিবর্তন। জরুরি অবস্থার অক্টোপাসে মানুষ ক্ষুব্ধ, তারপরে জগজীবন রাম ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসি গঠন করেন। এদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিরোধী ঐক্যে এমনকী সতীশুদ্ধ বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসুও ময়দানে বিজেপির অটলবিহারীর বাজপেয়ীর হাত ধরে এককাতারে নেমে আসেন। ফল, ইন্দিরা পতন ও জনতা সরকার গঠন; তারপর জনতা দলের স্ব স্ব প্রধান নেতাদের অন্তর্কলহে সেটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ইন্দিরার পুনরাবির্ভাবের পথ প্রশস্ত করে।

বামফ্রন্টের তিন দশকের সন্ত্রাসী বীভৎসতার নৃশংস অত্যাচারের ব্যাঘ্রগর্জনের পর তারা ক্ষমতার উৎস পুলিশের আনুগত্য হারিয়ে 'পুনর্মূষিক ভব' হয়ে এখন আলিমুদ্দিনে হাফু গেয়ে, নবান্নে গিয়ে ফিশফ্রাই খেয়ে নিজেদের অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এটি এই বিশ্বাসঘাতক বামপন্থী সরীসৃপদের শীতঘুম না কালঘুম সেটাই এখন বিচার্য।

কংগ্রেসের Known bedfellow হয়ে যখন বামপন্থীরা রাজ্যে তিন দশকের রাজত্ব গড়ে তুলেছিল, তখন গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল কারণ কোনও যথার্থ বিরোধী দল বা গোষ্ঠী ছিল না। আসলে Eternal vigilance is the Price of liberty এবং গণতন্ত্রে সেই Vigilance- এর কাজটা করে বিরোধী দল, মুক্তপক্ষ মিডিয়া ও প্রবুদ্ধ নাগরিক সমাজ। কিন্তু গাজরের লোভে যখন সকলে আত্মবিক্রিত সেবাদাসে পরিণত হয় তখনই হয় স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত। একদিন বামপন্থী স্বৈরতন্ত্রের অবসানে যে পরিবর্তনের সর্বাঙ্গীণ আন্দোলনে সাফল্য আসে তা আজ মুক্তচিন্তার ও স্বাধীন সমাজ সৃষ্টির বদলে গ্রিন গুণ্ডার

রাজত্বে পরিণত। এখানেও মূল সমস্যা একটিই, বিশ্বাসযোগ্য opposition-এর অভাব।

বাংলার রাজনীতিতে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার সুবর্ণ সুযোগকে ফলপ্রসূ করতে গেলে প্রয়োজন অর্থবহ বিরোধী রাজনীতির আন্দোলন ও নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা। সব শাসকদলই নিজেকে অতি বুদ্ধিমান ভেবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিফল না ফললেও অবশেষে তাদের ধূলিসাৎ হতে হয়। তাই দেখা যায়, ইউপিএ সরকার চুরির চিচিং ফাঁক করেও ভেবেছিল তাদের অপোগণ্ড গান্ধীর রাজত্ব অনিবার্য। বিপরীতে সমন্বয়ী রাজনীতি করে একদা যেমন অটলবিহারী বাজপেয়ী একটি সফল বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন তেমনি আবার জনসমর্থনের তরঙ্গদোলায়, একদা সর্বনিন্দিত নরেন্দ্র মোদী আজ সর্বভারতীয় নেতারূপে দীপ্যমান।

মোদীজীর উত্থানের কারণ নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা, যা গড়ে ওঠে প্রশাসনিক দক্ষতার অভিজ্ঞতা, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার বাগ্মিতা এবং তার পশ্চাতে সাংগঠনিক শক্তির অকুণ্ঠ সমর্থন। রাজনীতিতে সাফল্য লাভ করতে গেলে, জনগণের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন এবং তার জন্যে চাই সংগঠন। যখন দেশের প্রত্যন্ত গ্রামেও কংগ্রেস সেবাদল ছিল তখন তার যে শক্তি ছিল, আজ নেতাসর্বস্ব হওয়ায় সেটি শূন্যকুম্ভ গর্জনের মতোই অসার। সুতরাং কোথাও কোনও পরিবর্তনের সাফল্য আনতে গেলে, গ্রাম প্রধান ভারতে গ্রামের জনসাধারণ বা ভোটারদের সমর্থন না আদায় করতে পারলে সকলই বৃথা।

আসলে জনগণের প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হয় শাসকচক্রের অনাচারে, অত্যাচারে ও বঞ্চনার ব্যভিচারে। সেই প্রতিবাদকে সফল গণ-আন্দোলনে পরিণত করাই নেতৃত্বের কাজ এবং সেই নেতৃত্ব যদি গ্রামস্তরে না হয় তাহলে কলকাতায় টিভির তরজায় তাকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। একসময় বিজেপি নেতৃত্ব হতাশ হয়ে আক্ষেপ করতেন, এই বামপন্থী বুজরুকির বাংলায় কিছু করা যাবে না। পঞ্চাশের দশকে সর্বহারার মহান নেতাবাবুও একবার বলেছিলেন, আগামী একশো বছরেও এখানে বামপন্থী উত্থান হবে না। আসলে সময়ই যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তার ফলেই অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে।

বামপন্থী মহল তার জনবিরোধী নৃশংস রাজত্বের জন্য যে গণঘৃণার সৃষ্টি করে, তাতে তাদের খোলনলচে না বদলালে ঘুরে দাঁড়ানো শক্ত। অন্যদিকে বাংলার কুব্জা কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডের কুকুরের বুদ্ধির অপেক্ষায় থাকার ফলে অস্তিত্ব সংকটের মুখে। সেই জন্যেই গ্রিন রাজত্বের শুরুতেই যখন ভোটভিক্ষু রাজনীতি নির্লজ্জ, ধর্মান্ধ মোল্লাতোষণ আরম্ভ করে, তখন তার অত্যাচারে মানুষ স্বভাবত প্রতিবাদী হয়ে গেরুয়া পতাকার তলে সমবেত হয়। এমনকী মুসলমান সমর্থকেরাও মার খেয়েও বিজেপিকে সমর্থন করে। কিন্তু সেই সময় সেটি গতি হারায়, কেন্দ্রীয় সরকারের 'ধীরে চলো' নীতিতে রাজ্যসরকারকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রফা করার আশায়। তখনকার মতো সেটি ঝিমিয়ে পড়ার জন্যই পরের নির্বাচনে গ্রিন পার্টি ওয়াকওভার পায়।

বাংলার বিজেপিকে এখন দ্রুত গ্রামাঞ্চলে তার সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে, স্তিমিত শাখাগুলিকে সজীব করে তুলে। সেখানে দরকার একজন সংগঠনে অভিজ্ঞ কোনও নেতা এবং সেক্ষেত্রে মুকুল রায় খুবই ফলপ্রসূ হতে পারেন। মুকুল রায়ের সুবিধে হচ্ছে তিনি নীরব কর্মী এবং গ্রামাঞ্চলের রাজনীতির ও সেখানকার লোকজন তাঁর চেনা, তৃণমূলের রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের সময়। সরকারে আসার পর লালকমলদের আগ্রাসনে যে সংগ্রামী তৃণমূল কর্মীরা কোণঠাসা হয়ে বসে গেছে, তারা আবার একটি দুটি করে মুকুলের নেতৃত্বে সংগঠনে শামিল হতে পারে। তৃণমূলের উত্থানের মতোই সেই একটি দুটি ভাঙা ঢেউই অবশেষে প্রতিবাদের স্রোত সৃষ্টি করতে পারে।

দৃশ্যত মুকুল রায় তৃণমূল পার্টির ক্রমবিস্তারমান ক্যান্সারের ভুক্তভোগী, ভাইপোতন্ত্রের শিকার। গুণ্ডারাজ দমনের নাম করে সততার ঢাক বাজিয়ে যে মহান নেত্রী একদিন বলেছিলেন, জনগণ ছাড়া আমার কোনও পরিবার নেই, তাঁর হঠাৎ পালটে গেল মতটা, বদলে গেল ভোলটা। তাই তিনি দিল্লির গান্ধী কংগ্রেসের মতো একটা অশিক্ষিত, মূর্খ, ডিলবাজ অপদার্থকে পার্টির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর। সুরক্ষিত বলয়ে থাকা এই আকাট গুণধর গর্দভই নাকি প্রমাণ করবেন, পিসি আমাদের ভিত্তি এবং ভাইপো আমাদের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ যে জনপথ কংগ্রেসের পরিণতির মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন, তা বলাই বাহুল্য। এই ভাইপোবাজি প্রতিরোধে মুকুল হতে পারেন নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

দ্বিতীয়ত, যে সততার নাম করে নেত্রীর উত্থান, সেটি এখন সারদা-নারদা, উপাখ্যানে ঘোল খেয়ে বেড়াচ্ছে। আকাশে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, দিদির পায়ে হাওয়াই চটি ভায়েরা সব ক্রোরপতি। রাস্তায় রাস্তায় রঙ হচ্ছে আর চিচিং ফাঁকের টাকা যাচ্ছে কালীঘাটের আনাচে কানাচে। দাদা কত ঘি খায়, তার চেহারা দেখলে বোঝা যায়; তাই কে কত সততার প্রতীক তা ক্ষমতায় গেলে যে বোঝা যায়, তা মুকুলের মতো আর কেউ জানে না।

তৃতীয়ত, সেকুলার বাংলায় মুসলমান উন্নয়ন নয়, মোল্লাতোষণ এমন নির্লজ্জভাবে এর আগে কেউ করার ধৃষ্টতা দেখায়নি। শুধু অন্যায় করাই নয়, আবার তড়পানো— বেশ করেছি, খুব করেছি। মুসলমান, মুসলমান করে এই মমতাজের এমন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল যে শুধু মাদ্রাসা, মক্তব, মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়, ইমামভাতা, মুসলমান হাসপাতাল করাই নয়, ভোটব্যাঙ্কের দাবিতে খুনি, ধর্ষক, দাঙ্গাবাজদের প্রশ্রয় দিয়ে বাংলায় একটি মিনি পাকিস্তান গড়ে তোলাই যেন তাঁর ব্রত।

মোদীজী প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভারতের রাজনীতিতে সেকুলারিজমের নাম করে Muslim appeasement নীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, যাতে জনাব জিন্নাহর কথামতো তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ব্লক ভোটে নিয়ামক শক্তি হয়ে না ওঠে। এটি রোধ করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন।

সেক্ষেত্রে রক্ষাকর্তার ভূমিকায় সেকুলার রাজনীতির নামে কমিউনাল পক্ষপাতিত্বের অবসানে সবল বিজেপি সংগঠন ও নেতৃত্বকেই স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে, সংকীর্ণ পেটি পলিটিক্সকে গুরুত্ব না দিয়ে। ■

শিশু স্থূলত্বের খুঁটিনাটি

ডাঃ রিংকী ব্যানার্জী

বাচ্চাদের স্থূলত্ব অর্থাৎ অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়ে যাওয়া, এখন একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেখা গিয়েছে, আট থেকে আঠারো বছর বয়সীদের মধ্যে এই রোগটা বেশি হচ্ছে। তবে শিশুদের এরকম অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি এবং দ্রুত হারে এই রোগ বেড়ে চলার পিছনে কিছু কারণ আছে, যা আমাদের প্রাত্যহিকতা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মধ্যে লুকিয়ে আছে। অনেকেই হয়তো জানেন না, স্থূলত্ব থেকে পরবর্তী সময় গুরুতর রোগ হতে পারে। তাই কীভাবে প্রতিরোধ করবেন স্থূলত্ব এবং সন্তানকে সুস্থ জীবন দেবেন, সে সম্পর্কে বাবা-মায়ের সম্যক জ্ঞান থাকা ভীষণ দরকার।

স্থূলত্বের কারণ

স্থূলত্বের কারণ হিসেবে তিনটি দিককে চিহ্নিত করা হয়। জেনেটিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান। প্রথমে বলি পরিবেশের কারণে বাচ্চারা স্থূলত্বের শিকার হয় কীভাবে। আজকাল বিকেলবেলা মাঠে ছুটোছুটি করে খেলার কনসেপ্ট অনেকেই ভুলতে বসেছে। সেই সঙ্গে আছে পড়াশোনার চাপ। কোনও স্কুলে তেমনভাবে খেলাধুলো করার মতো জায়গা থাকে না। ফলে তাদের ফিজিক্যাল অ্যাকটিভিটি কমে গিয়েছে। মোবাইল, টিভি, ভিডিয়ো গেম এসব নিয়ে তারা মগ্ন হয়ে থাকছে। আর বাচ্চাদের ওজন হু-হু করে বেড়ে যাওয়ার জন্য বহুক্ষেত্রেই বাবা-মায়েরা ভীষণভাবে দায়ী। বাচ্চাকে মোটাসোটা বানানোটা বহু অভিভাবকদের জীবনের 'মোটো' হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে কারও বাচ্চা যদি রোগা হয়, তাহলে তিনি যেন-তেন-প্রকারেণ চেষ্টা করেন সন্তানকে মোটাসোটা করে তুলতে। বাচ্চা মোটা হবে, এই ধারণাটাই গোড়া থেকে বদলাতে হবে। এছাড়াও দেখা গিয়েছে, সমাজের উঁচু তলায় এই ধরনের রোগ অপেক্ষাকৃত বেশি হচ্ছে। ফাস্টফুড, কোল্ডড্রিঙ্কস ভীষণভাবে দায়ী তাদের এই রোগের জন্য। অবশ্য বিভিন্ন রোগ এবং নানা ধরনের ওষুধের কারণেও এই রোগ হতে পারে। অনেক সময় আবার অভ্যেসের বদলের কারণেও স্থূলত্ব দেখা যায়। সপ্তাহে তিনদিনই হয়তো বাবা-মায়ের সঙ্গে বাচ্চাটি ডিনার করছে বাইরে। ফলে ডায়েট কন্ট্রোলে থাকছে না। প্রত্যেক বাবা-মায়ের জানা উচিত, কোন খাবারে ক্যালরি কতটা। তারা যেন সেটা বাচ্চাকেও শেখান। তাহলে ছোটরা সতর্ক হবে।

সমাধান :

সন্তানের এক বছর বয়স থেকেই বাবা-মাকে তার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কিছু কিছু জিনিস তার ডায়েট থেকে বাদ দিতে হবে। এই বয়সে বাচ্চার ওয়েট বাড়ানোর জন্য অনেকেই বেশি পরিমাণে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করেন। নিয়মিত মাখন কিংবা ঘি খাওয়ান, যা কিন্তু একদম উচিত নয়। সেটাও নির্দিষ্ট করে রাখা উচিত, কোনদিন খাওয়াবেন এবং কোনদিন খাওয়াবেন না কোল্ড ড্রিঙ্কস সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত। বাচ্চাকে সাইকেল চালাতে, সাঁতার কাটতে, সকালে বিকেলে খেলাধুলা করতে উৎসাহ দিন। যদি কখনও দেখেন বাচ্চার ওজন বেড়ে যাচ্ছে, তখনই তা কন্ট্রোল করতে হবে। একবার ওজন বেড়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। আগে থেকেই তার পথরোধ করুন।

প্রথম থেকেই দেখতে হবে, ক্যালরি গ্রহণ এবং তা খরচে যেন একটা সামঞ্জস্য থাকে। ইদানীং তো বাচ্চাদের জিমও খুলে গিয়েছে, প্রয়োজন হলে বাচ্চাকে জিমে পাঠান। বাচ্চাদের সঠিক গ্রোথের জন্য ডায়েটে প্রচুর পরিমাণে জল, সবজি এবং ফল থাকাটা বাঞ্ছনীয়। অনেকেই বাচ্চাকে ফলের রস খাওয়ান। সেটা না করে ওদের গোটা ফল দিন, বিশেষ করে যাদের ওজন বাড়ার সমস্যা রয়েছে। কারণ জুস শরীরে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, তাই ওজন বাড়ে বেশি। সেই সঙ্গে বাচ্চাকে এটাও বোঝানো প্রয়োজন যে, মোটা হয়ে গেলে তাকে দেখতে মোটেই ভালো লাগবে না, তাহলে তারা নিজেরাও খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সচেতন হবে। অনেক সময় বাচ্চারা মোটাসোটা হয়ে গেলে বাবা-মায়ের খুব খুশি হন। কিন্তু অতিরিক্ত ওজন বাড়া তাদের সন্তানদের জন্য কী বিপদ ডেকে আনতে পারে, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন হওয়াটা খুব প্রয়োজন।

স্থূলত্বের কারণে অনেক অসুখ দেখা যায় খুব কম বয়স থেকে। যেমন— ব্লাড সুগার। অনেকে আবার হাইপারটেনশনের শিকার হয়। প্রেসার, কিডনির সমস্যা হতে পারে, স্কিনেও নানা রকম প্রবলেম দেখা দিতে পারে। তাই বাচ্চার খাওয়াদাওয়া ও ওজন সম্পর্কে প্রথম থেকেই সতর্ক হোন। সব সময় মনে রাখবেন, সুস্থ শরীরেই সুন্দর মনের বাস।

মোবাইল : ৮৩৭১০২৫৫০৫

বয়েস প্রায় আশি, তবুও শেকড় খুঁজতে দেশে ফেরেন অবতার

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশে ফেরার সুযোগ পেলে অবতার সিংহ সোহাল কখনও ছাড়েন না। দেশেই তাঁর শেকড়। ফিরতে পারলে সেই শেকড়ে ফেরার অনুভূতি হয়।

ভারতের বাইরে তাকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রীড়াবিদ বলে মনে করা হয়। অবতার সিংহ সোহাল তিনবার কেনিয়ার হকিদলকে অলিম্পিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সর্বসাকুল্যে চারবার অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন একটা সময়ে তিনি স্টিক হাতে মাঠে নামতেন যখন মনে করা হতো শিখেরাই বিশ্বহকির পাওয়ার হাউস। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে হকি টেস্টম্যাচ খেলার জন্য আমি প্রথম দেশে আসি ১৯৬২ সালে। তখনকার বম্বে এয়ারপোর্টে নেমেই ভারতের পবিত্র মাটি মাথায় ঠেকিয়েছিলাম। সেদিনের সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

চারবার অলিম্পিক খেলা অবতার সিংহ সোহাল এখন বৃদ্ধ। আটাত্তরে পা দিয়েছেন। কিন্তু তরুণ বয়েসে যে মন হকিকে দিয়েছিলেন, ফিরিয়ে নিতে পারেননি আজও। নিরবচ্ছিন্ন হকিসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ গিনিস বুক অব রেকর্ডস তাঁর নাম ১৯৮৪ সালে নথিভুক্ত করে। ১৯৫৭-১৯৭২— এই পনেরো বছরে তিনি ১৬৭ বার কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গিনিস বুক অব রেকর্ডসে স্থান পাওয়ার যোগ্য তিনি। হকির বিখ্যাত ধারাভাষ্যকার জসদেব সিংহ বলেন, 'একজন খেলোয়াড় চারবার অলিম্পিকে অংশ নিচ্ছে, তার মধ্যে তিনবার দেশকে (কেনিয়াকে) নেতৃত্ব দিচ্ছে— রেকর্ড হিসেবে এটা বিস্ময়কর। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে অবতার নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।'

১৯৭১ সাল। সেবার বিশ্বকাপ হকির সেমিফাইনালে ভারত এবং কেনিয়া

মুখোমুখি হয়েছিল। সেই ম্যাচের স্মৃতি এখনও অবতার সিংহ সোহালের স্মৃতিতে টাটকা। ম্যাচটা ছিল টেনশনের। হাফটাইমে ভারত ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল। অবতার সিংহ বলেন, 'হকির প্রথম বিশ্বকাপে আমরা ভারতকে হারিয়ে ব্রোঞ্জে মেডেল জেতার মতো অবস্থায় চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষবেলায় পরপর দুটো গোল করে ভারত ম্যাচ জিতে যায়।

অবতার সিংহ কেনিয়ার অধিনায়ক হন ১৯৬২ সালে। সেসময় কেনিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা টেস্ট সিরিজ খেলছিল। পরের দশ বছরে তাঁর অধিনায়কত্বে কেনিয়া এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল যে বিশ্বের প্রথম সারির দলগুলোর পক্ষে তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ১৯৬০ সালে তিনি প্রথম কেনিয়ার হকি দলে নির্বাচিত হন। তারপর টোকিও অলিম্পিকে (১৯৭২) দেশকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালে বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হকির প্রথম বিশ্বকাপেও তিনি কেনিয়ার অধিনায়ক ছিলেন।

রিও অলিম্পিকে কেনিয়া ছিল না। কিন্তু অবতার সিংহ সোহাল ছিলেন। হকির আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের পর্যবেক্ষক হয়ে এসেছিলেন। ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায় তিনি বলেন, 'কেনিয়া ছাড়া অন্য যে দেশের বিরুদ্ধেই ভারত খেলুক, আমি ভারতের হয়ে গলা ফাটাই। ভারতের সঙ্গে আমার আবেগের সম্পর্ক। আমাদের বাড়ি জলন্ধরে। ওখান থেকেই আমার বাবা-মা কেনিয়ায় গিয়েছিলেন। তাছাড়া ভারতে আসার গুরুর ঘর।' রিও অলিম্পিকে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের আর এক মহীরুহ শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। দু'জনেই ভারতীয় হকি দলের সমর্থনে তুমুল গলা ফাটিয়েছেন।

হকির প্রতি তাঁর ভালোবাসার উৎসমুখের সন্ধান দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমার মনে আছে, ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে ভারতের হকিদল কেনিয়ায় গিয়েছিল। দলে আরও কয়েকজন দিকপাল খেলোয়াড় ছিলেন। ধ্যানচাঁদের ড্রিবলিং আর ডজিং দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি হকিই খেলব। স্কুলে থাকতে আমি ক্রিকেট খেলতাম।'

ব্যক্তিগত জীবনে অবতার সিংহ সোহাল ধর্মভীরু মানুষ। দেশে ফিরলে ফগোয়ারার পিতৃপুরুষের গ্রামে যেমন ঠিক তেমনই মাথা ঠেকিয়ে আসেন পটনা সহিব, হজুর সহিব, রিঠা সহিব গুরুদোয়ারায়। সঙ্গে থাকেন স্ত্রী রিপুদমন কওর এবং কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

শেকড়ের টানেই তাঁর দেশে ফেরা। প্রাণখোলা হাসিতে ফুটে ওঠে ফেরার তৃপ্তি। হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি যখন গ্রামে যাই কিংবা রিঠা সাহিবে মাথা ঠেকাই, মনে হয় আমি যেন গুরু নানকদেবজীর কোলে শুয়ে আছি। মনপ্রাণ সব ভরে যায়।' ■

পরলোকে রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিকের জীবনাবসান হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি 'ডায়াবেটিস' রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। গত ১২ নভেম্বর সকাল সাতটায় কলকাতায় বিশুদ্ধানন্দ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর। তাঁর জন্ম ৮ ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে। ১৯৭২-এ পদার্থ বিজ্ঞানে অর্নাস-সহ স্নাতক হওয়ার পরই সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেন। উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙ্গা নগর প্রচারক হিসেবে তাঁর প্রচারক জীবন শুরু। বাবা হরেকৃষ্ণ প্রামাণিক ও মা প্রভাবতী প্রামাণিকের নয় সন্তানের তিনি কনিষ্ঠ (৫ ভাই ৪ বোন)। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় দীর্ঘ ২২ মাস মিসাতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সেই সময়েই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বর্তমানে শুধু তাঁর মেজদা ও মেজদি জীবিত আছেন। মৃত্যুকে তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন। নিজেই মজা করে বলতেন— তাঁর তিন ভাই-বোনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে— কে আগে যায়!

সঙ্ঘের প্রয়োজনে যখন যেমন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তখনই যোগ্যতার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন। সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক, প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ, প্রান্তের শারীরিক প্রমুখ হিসেবে কাজ করেছেন। সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে মুখ্য শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, কর্মকৌশল সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। হাওড়া শিবপুরে নতুন কার্যালয় 'কেশব স্মৃতি' নির্মাণে তাঁর ভূমিকার কথা হাওড়ার স্বয়ংসেবকেরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

কয়েক বছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্বে কাজ করেছেন। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক ও পরে পরিষদের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯২ সালে সঙ্ঘের উপর তৃতীয়বার নিষেধাজ্ঞা জারি হলে তিনি মাসাধিক কারাগারে বন্দি ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বলা ও লেখায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। জেদি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আপন কর্তব্যে অটল। কোনও বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ নিখুঁত ভাবে তিনি করতে পারতেন। বিশেষ প্রকাশনার কাজে ও সামায়িক ভাবে স্বস্তিকার দপ্তরেও কাজ করেছেন। সর্বদা হাস্যময় রোহিণীদা ছিলেন সকলের প্রিয়। প্রয়াত নারায়ণদা (নারায়ণ পাল)-র সঙ্গে তাঁর খুনসুটি সকলের উপভোগের বিষয় ছিল। বস্তুত তাঁর কৌতুকবোধ মনে রাখার মতো। একই সঙ্গে তিনি ভোজন রসিক। রসেবসে থাকতে ভালবাসতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন এক নক্ষত্রস্বরূপ। তিনি তাঁর আলো দিয়ে সকলকে আলোকিত করে নক্ষত্রলোকে যাত্রা করেছেন। তাঁর প্রতি রইল স্বস্তিকা পরিবারের আন্তরিক শ্রদ্ধা। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি জেলার পূর্বতন জেলা কার্যবাহ প্রবীণ সিংঘলের পিতৃদেব বালচন্দ আগরওয়াল গত ৯ নভেম্বর বিহারের কিষাণগঞ্জের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। স্বর্গীয় বালচন্দজী ১৯৫৭ সালে লখনউয়ে স্বয়ংসেবক হন। তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা প্রাপ্ত বালচন্দজী উত্তর বিহার প্রান্তে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর প্রান্ত সহ-সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিদ্যাভারতী, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ট্রাস্ট, ভূতনাথ গোশালার মতো বহু সামাজিক সংস্থার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি শিলিগুড়ি কোর্টের ব্যবহারজীবী ছিলেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের জেলা সভাপতি অরুণচন্দ্র পালের মাতৃদেবী নূপুর পাল গত ২৩ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্বামী, ৬ পুত্র, ৬ পুত্রবধু এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক নীলোৎপল রায়ের মাতৃদেবী মুকুল রায় গত ৯ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ১ পুত্র ও পুত্রবধু, ২ কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

আমরাও সাংবাদিক

আমরা দেশ বিদেশের খবর জানতে পারি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে। টিভি, রেডিয়ো, সংবাদপত্র, স্যোশাল মিডিয়া, ওয়েব নিউজ আরও কত মাধ্যম। সাংবাদিকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে এনে আমাদের সামনে তা তুলে ধরেন। তারা না থাকলে আমরা জানতেই পারবো না

প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সারা পৃথিবীতে কত কী ঘটে চলেছে। কিন্তু তাদের পক্ষেও সম্ভব হয় না সব খবর তুলে ধরা। হয়তো আমাদের আশেপাশেই ঘটা অনেক ঘটনা তাঁরা সংবাদমাধ্যমে নিয়ে আসতে পারেন না। এই সমস্যা দূর করতে আজকাল এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। সেটি হলো নাগরিক সাংবাদিকতা। এই সাংবাদিকতায় সংবাদমাধ্যমের কোনো সাংবাদিককে আসতে হয় না। আমরা নিজেরাই সংবাদ পৌঁছে দিতে পারি সংবাদমাধ্যমের কাছে।

এখন আমাদের সবার কাছে স্মার্টফোন আছে। সেই ফোনে আমাদের পাড়ার কোনো ঘটনার ছবি বা ভিডিয়ো তুলে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারি কোনো টিভি চ্যানেলে। সঙ্গে সেই ঘটনার কিছু বর্ণনা ও তথ্য। সংবাদমাধ্যম সেই ভিডিয়ো ও তথ্য সম্পাদনা করে টিভি-তে সম্প্রচার করতে পারবে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও তাই। সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে বা সংবাদ বিভাগে আমরা কোনো ঘটনার ছবি সহ তথ্য পাঠাতে পারি।

নাগরিক সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো স্যোশাল মিডিয়া। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট এখন সহজলভ্য হওয়ায় সবাই ফেসবুক, ট্যুইটার ব্লগিং, হোয়াটস্ অ্যাপ করে থাকে। আমরা সেসব মাধ্যমকে ব্যবহার করে কোনো অপ্রকাশিত সংবাদকে সবার সামনে তুলে ধরতে পারি।

রাস্তায় চলতে চলতে, স্কুলে যেতে যেতে, পাড়ায় প্রতিদিনের কত ঘটনা চোখে পড়ে। আমরা খুব সহজে সেই ঘটনাকে সংবাদের রূপ দিতে পারি। এর জন্য কেবল দরকার খাতা-কলম বা একটি স্মার্টফোন, যেগুলো এখন প্রায় সবই আমাদের হাতের মুঠোয়। তাই এখন থেকেই আমরা শুরু করে দিতে পারি নাগরিক সাংবাদিকতা। আমরাও হয়ে উঠতে পারি সাংবাদিক।

সংবাদমাধ্যমও এই ধরনের সাংবাদিকতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। নাগরিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্থানীয় অনেক খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং তার সমাধান হয়েছে। রাস্তা খারাপ, অপরিচ্ছন্ন হাসপাতাল, অসামাজিক কাজকর্ম যেগুলো প্রতিনিয়ত ঘটছে আমরা নাগরিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে সেগুলোকে তুলে ধরতে পারি। কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে কখনো কোনোভাবে যাতে ভুল তথ্য পাঠানো না হয়। অনেক সময় আমরা নিজের অজান্তেই ভুল খবর অন্যকে জানাই, এ বিষয়ে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার এরকম ভুল খবর, ভিত্তিহীন খবর সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা সেই ভুল তথ্যেই না পাঠাই। কম্পিউটার সফট্ওয়্যারে কোনো ছবি এডিট বা সম্পাদনা করা কখনোই উচিত নয়। আইনের চোখে তা অপরাধ।

নাগরিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিশ্বে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। যেমন ২০০৯ ইরানের লক্ষ লক্ষ মানুষ একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে তেহেরানের রাস্তায় নেমে এসেছিল। তা সম্ভব হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয়তায়। তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের একটি বড় ঘটনা 'আরব বসন্ত'। তাতেও একটা বড় ভূমিকা ছিল নাগরিক সাংবাদিকতার। তাই অন্যান্য পেশাভিত্তিক সাংবাদিকতার মতো এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিকতা।

বিরাজ নারায়ণ রায়

ভারতের পথে পথে

শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরি

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ রাজনৈতিক জীবন থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পর অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। পন্ডিচেরি আশ্রমে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হন। ১৯২৬ সালে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। ঋষি অরবিন্দ ছিলেন ভারত মায়ের পূজারি। তাঁর ধ্যান ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ। তাই তিনি অখণ্ড ভারতের মানচিত্রের সমানে বসে দেশমাতৃকার ধ্যান করতেন। জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি সেখানেই কাটিয়েছেন। অরবিন্দ শিষ্যা শ্রীমা এই আশ্রমেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে পন্ডিচেরি আশ্রম অধ্যাত্ম সাধনার একটি কেন্দ্র। সারা বিশ্ব থেকে শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমার হাজার হাজার অনুগামী এখানে আসেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

समय: कथम् अतिशीघ्रम् अतीत:।

সময় কেমন এত তাড়াতাড়ি কাটল।

युक्ते समये आगतवान्।

ঠিক সময়ে এসেছ।

एकनिमेष: विलम्ब: चेत् अहं गत: स्याम्।

এক মিনিট দেরি হলে তো আমি চলে যেতাম।

अहमपि भवता सह आगच्छामि किम्?

আমিও কি তোমার সঙ্গে আসতে পারি?

किञ्चित्कालं ददाति किम्?

কিছু সময় দিতে পারবে কি?

ভালো কথা

পা-ভাঙা কুকুরের ছানা

রোজকার মতো স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দেখি একটা কুকুরের ছানা রাস্তায় কুঁইকুঁই করছে। কেউ তার পায়ের ওপর সাইকেল বা মোটসাইকেল চেপে দিয়েছে। ওর পিছনের একটা পা ভেঙে গেছে। আমি সাহস করে ছানাটিকে সাইকেলের ঝুড়িতে করে বাড়ি নিয়ে এসে চালাঘরে লুকিয়ে রাখলাম। ভয়ে ভয়ে আছি মা-তো খুব বকা দেবে ভেবে। কিন্তু ওর কুঁইকুঁই শুনে মা এসে ওর পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। আমি বাটিতে করে দুধ খাওয়ালাম। পরদিন সকালে দেখি ও অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে। স্কুলে যাবার সময় ওকে ওর মা'র কাছে দিয়ে আমি স্কুলে গেলাম। ফেরার সময় আমাকে দেখে আনন্দে লেজ নাড়াতে লাগলো।

সৌম্যদীপ ব্যানার্জী, চতুর্থ শ্রেণী, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

কাজের মানুষ

তমালিকা দাস, চতুর্থ শ্রেণী, কলকাতা-৯

সকালবেলায় ছাতা মাথায়
স্কুলের দিকে যাই
আমার পিঠে বইয়ের ব্যাগ
তাড়াতাড়ি পা চালাই।

স্কুল ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকে
প্যাঁ প্যাঁ বজায় হর্ন
বৃষ্টি বাদল সব ঋতুতে
কাজের মানুষ একজন।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২

তার পিতা অর্জুন, অন্যান্য পুত্রদের চাইতে বেশি ভালবাসা সত্ত্বেও তাকে খুব সাহায্য করতে পারেননি।

কিন্তু হায়! নিজেদের ভাগ্যদোষে পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হলো। কৌরবরা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18

27 November - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।